ত্রৈমাসিক

র্ষ ঃ ৩। সংখ্যা ঃ ১২। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISSN 1813 - 0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৩ সংখ্যা : ১২

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭

যোগাযোগ : এস এম আবদুল্লাহ
সমন্বয়কারী
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
১৪ পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা)
শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : তাসনিম কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে : আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ৩৫ টাকা US $ 3

---

*Published by Advocate **MUHAMMAD NAZRUL ISLAM** General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 14, Pisciculture Bhaban (3rd Floor) Shymoli Bus Stand, Dhaka-1207,Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US $ 3*

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

আমাদের সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে

বলা হয় আমরা অস্থির সময় অতিক্রম করছি। কথাটা বিশ্লেষণ করা দরকার। কারণ সময় যতটা না অস্থির তার চেয়ে বেশি অস্থির আমরা নিজেরাই। সময়কে অস্থির করে তোলা হয়েছে এবং তাকে অস্থির করেছে কুফরী ও শিরক। আর এই কুফরী ও শিরক কোনো দিন বসে থাকেনি। তারা সব সময় তাদের অভিযান চাপিয়ে সময়কে অস্থির করে রেখেছে।

এই কুফরী ও শিরক অবস্থান করছে আমাদের ভেতরে ও বাইরে। হাজার দেড় হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় আমরা যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি বাইরের শত্রুদের দ্বারা তার চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হইনি ঘরের শত্রুদের আঁতাত ও চক্রান্তমূলক কর্মকাণ্ডে। আমাদের এ ঘরের শত্রুরা মীরজাফরদের মতো অন্যের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে, না বিভীষণদের মতো সচেতনভাবে শত্রুশিবিরে যোগ দিয়েছে তা বিচার সাপেক্ষ। এই বিচারের ভিত্তিতে তাদের সম্পর্কে ফয়সালা হওয়া দরকার। নবীর প্রতি বিশ্বাস ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আমাদের ঈমানের অংগ। এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। এটা কোনো গবেষণার বিষয় নয়। এটা একটা সাদামাটা কথা। মুসলমান কোনো বর্ণগত বা জন্মগত জাতিগোষ্ঠী নয়। আল্লাহ ও তাঁর নবী ও রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই একজন মুসলমান হয়। আর এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নবীর প্রতি ভক্তি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। কাজেই নবীকে ব্যংগ করে কার্টুন তৈরি করা, কবিতা ও রচনা লেখা বা অন্য যেকোনো মানসিক ও শারীরিক অভিব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের পরিপন্থী। কোনো অবিশ্বাসী যখন এ কাজ করে তখন তাকে মানবতার শত্রু, বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের হোতা, বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী এবং সবচেয়ে বড় মিথ্যুক ও ভণ্ড বলা যায়। কারণ সুন্দর এই পৃথিবীর সৌন্দর্য ও শালীনতা অনুভব করার কোনো ক্ষমতা ও রুচি সে হারিয়ে ফেলেছে। আর কোনো বিশ্বাসী যখন এ কাজ করে তখন সে অবিশ্বাসী হয়ে যায়। সে আর বিশ্বাসী থাকে না।

এখন দেখতে হবে সে কি সত্যিই আগে বিশ্বাসী ছিল এবং এখন অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, নাকি সে বিশ্বাসীর ছদ্মবেশে অবিশ্বাসী। সে মীরজাফর না বিভীষণ কোন পর্যায়ের জাতশত্রু এটাও বিচার করতে হবে। আস্তিনের মধ্যে এ ধরনের শত্রুদের পালন করার দায় সচেতন মুসলিম মিল্লাত কোনোদিন বহন করেনি। কুরআনের প্রথম সূরা আল বাকারায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রথম রুকুর প্রথম ৭টি আয়াতে ঈমান ও একীনের বিষয়টি পাকাপোক্তভাবে বর্ণনা করার পর দ্বিতীয় রুকুর প্রথম আয়াত থেকেই এইসব বিশ্বাসীর ছদ্মবেশে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, 'আর (আল্লাহর ওপর প্রকৃত ঈমান আনার পর) কিছু লোক এমনও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কিন্তু আসলে তারা বিশ্বাসী (মুমিন)' নয়; তারা আল্লাহ ও যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে প্রতারণা করছে। অথচ আসলে তারা নিজেদেরকে প্রতারণা করছে,

এটা তারা বুঝতে পারছে না। তাদের অন্তরে একটি রোগ আছে অতপর আল্লাহ সে রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী।' এরপর আল্লাহ এই মিথ্যাচারী প্রতারকদের ভূমিকা আরো স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন, 'যখনই তাদের বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।' আল্লাহ বলছেন, 'সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, তবে এরা তা বুঝতে পারে না।'

আমাদের এই ঘরের শত্রুদের মুখোশ আল্লাহ যেভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাতে তাদের চিনে ফেলা মোটেই কঠিন নয়। পশ্চিমের ইউরোপীয় খৃস্টীয় ও ইহুদী চিন্তার প্রাধান্যের দিন থেকেই এরা তাদের হাত পা নাড়াচাড়া করছেন। নিজেদের বিশ্বাসকে এরা ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করার চেষ্টা কোনোদিন করেননি। বিশ্বাস বিশ্বাসই। বিশ্বাস এদিকেও যেতে পারে, ওদিকেও যেতে পারে। এদিকের বিশ্বাস যদি তাদের কাছে যুক্তিসংগত না হয়ে থাকে, তারা ওদিকে চলে যেতে পারতেন। তা তারা করেননি। তারা গাছের ওপরেরটাও খাবেন আবার তলারটাও কুড়াবেন। পশ্চিমের প্রভুরা চলে যাবার পর তারা এখানে নিজেদের স্বাধীন দেশে পূর্বের প্রভুদের কার্যোদ্ধারের দায়িত্ব নিয়েছেন। তারা পূর্বের প্রভুদের এজেন্ট। এজেন্সি যখন খুলে বসেছেন তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে খুলে বসতেন। আমাদের কোনো আপত্তি থাকতো না। কিন্তু এ ছদ্মবেশ কেন? পশ্চিমা প্রভুদের সুরে সুর মেলাচ্ছেন প্রথম আলো ও সাপ্তাহিক ২০০০। এর আগে তাসলিমা নাসরিন ও দাউদ হায়দার দেশত্যাগী হয়েছেন। বিদেশে গিয়েও তারা তাদের পূর্বের কর্মকাণ্ড যথারীতি জারি রেখেছেন। তার আগে এখানে আহমদ শরীফ, এনামুল হক এবং আরো অনেক নাস্তিক পাতি নাস্তিকের আবির্ভাব ঘটেছে। মুসলিম মিল্লাত এদের কারোর সাথে আপোশ করেনি এবং এদের কেউও তওবা করে মিল্লাতে ফিরে এসে তাদের ইসলামের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ দেয়নি। এখন যারা তওবার নাটক মঞ্চস্থ করছেন তাদের ব্যাপারে মিল্লাতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। কারণ এরা এদেশেই থাকছেন। এরকম আরো নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য।

আমাদের অবস্থানিক দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে মুসলিম মিল্লাতকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা না চালালে এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতেই থাকবে। তাই একটি শতকরা ৮৫/৯০ ভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন মুসলিম দেশে মুসলিম উলামা, ইসলামী চিন্তাবিদ ও আইনজ্ঞদের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কথা সবাই চিন্তা করেন। কিন্তু এভাবে দেশবাসীর ঈমানের ওপর আঘাত হানা যে কেবলমাত্র ধর্মীয় নয় বরং যথার্থই একটি সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা এ কথা উপলব্ধি করতে হবে। এর মাধ্যমে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং এটাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হয়। তাই সকল পর্যায়ের দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

বিশেষ করে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য এজন্য একান্ত জরুরী। উলামায়ে কেরাম এবং ইসলামী চিন্তাবিদ ও আইনবিদগণ একত্র হয়ে এ ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু কর্মসূচি অবলম্বন করতে পারেন।

আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১২, পৃষ্ঠা : ৭-২৫

বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষ্য : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বাদী-বিবাদী উভয়ের মাঝে 'সাক্ষ্য' একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাদী তার দাবি বিচারকের কাছে প্রমাণ করতে চাইলে তাকে তার সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে হয়। অনুরূপভাবে বিবাদী যদি বাদীর দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে, তবে সে ক্ষেত্রে তাকেও সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে হয়। কাজেই বাদী-বিবাদী উভয়ের মাঝে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে 'সাক্ষ্য-প্রমাণ' এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে সাক্ষীর নৈতিক গুণাবলীর ভূমিকা অপরিসীম। কেননা সাক্ষী যদি যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে ইনসাফ ভিত্তিক বিচারকার্য সমাধা করা সম্ভব। পক্ষান্তরে সাক্ষী যদি অসত্য সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে বিচারকার্য ব্যাহত হবে এবং বিচারপ্রার্থী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ পর্যায়ে অত্র প্রবন্ধে সাক্ষ্য-এর পরিচয়, বিধান, উপাদান, প্রয়োজনীয়তা, যাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, যাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, শর্ত সাপেক্ষে যাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, সাক্ষীর সংখ্যা, নারীর সাক্ষ্য এবং যে সকল অবস্থায় সাক্ষ্য বাতিল হয়, সাক্ষ্য প্রত্যাহার ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা স্থান পাবে।

আভিধানিক অর্থ: 'সাক্ষ্য'-এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'আশ-শাহাদাহ' 'আল-মুশাহাদাহ' থেকে এটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এর মূল ধাতু হচ্ছে শা-হা-দা। সাক্ষ্যকার্য মূলত 'আশহাদু' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি) শব্দ দ্বারা কার্যকর হয়।

'সাক্ষ্য' এমন বিষয়, যা জ্ঞান অর্জন ব্যতীত প্রদান করা যায় না অর্থাৎ কোন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত সাক্ষ্য দেয়া যায় না এবং তা জায়েযও নয়।

ইমাম আর-রাগিব আল-ইসফাহানী র. বলেন, 'শুহুদ ও শাহাদাহ' শব্দ দু'টি চক্ষু অথবা বোধশক্তির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা, উপস্থিত থাকা এবং কখনো শুধু উপস্থিত হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তিনি 'শাহাদাহ' এর অর্থ লিখেছেন : যে কথা পূর্ণ জ্ঞান ও প্রত্যয়ের সাথে বলা হয়, তা চক্ষু দ্বারা দর্শনের মাধ্যমেই অর্জিত হোক অথবা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে।[১]

১. আকাইদ শাস্ত্রমতে, 'আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ স. তাঁর বান্দা ও রসূল'-এরূপ স্বীকারোক্তিকেও 'শাহাদাহ' (সাক্ষ্য) বলে। যেমন- আমরা বলে থাকি : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ স. তাঁর বান্দা ও রসূল'।[২]

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব সোশাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

২. আখিরাতে পূর্ববর্তী উম্মতের কার্যাবলীর বিষয়ে মুসলমানদের সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কেও 'শাহাদাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে : 'এবং এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবে।'[৩]

তবে এ নিবন্ধে প্রধানত আদালতের বিচারিক বিষয়ে যে সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় তাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

পারিভাষিক অর্থ

'অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'সাক্ষ্য' শব্দযোগে আদালতে যথার্থ সংবাদ পরিবেশন করাকে 'সাক্ষ্য' বলে।'[৪] তুরস্কের উসমানী খিলাফতের প্রায় শেষ পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগে ইসলামী আইনের যে সংকলন প্রণয়ন করা হয় তাতে (ধারা ১৬৮৪) সাক্ষ্যের নিম্নোক্ত সংগা প্রদান করা হয়েছে : 'বিচারক কিংবা বিচারক পর্যায়ের কারো সামনে এবং বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে অথবা তাদের কোন পক্ষের উপস্থিতিতে তাদের একের নিকট অপরের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা বা কোন অপরাধ প্রমাণের উদ্দেশ্যে 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' শব্দযোগে সংবাদ প্রদান করাকে 'সাক্ষ্য' বলে'।[৫]

কাওয়াইদুল ফিকহ গ্রন্থে 'সাক্ষ্য'-এর সংগায় বলা হয়েছে, বিচারকের মজলিসে 'শাহাদাহ' শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে চাক্ষুষ বিষয়ে অন্যের দাবির অনুকূলে কারো বিপক্ষে সঠিক সংবাদ প্রদান করাকে 'সাক্ষ্য' (শাহাদাহ) বলে।[৬]

সুতরাং এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষ্য ও সাক্ষ্যদানের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।

'সাক্ষ্য'-এর প্রয়োজনীয়তা

অজানাকে জানার প্রচেষ্টা দুর্নিবার। তবে অজানাকে জানার এবং অনুসন্ধান করে তা খুঁজে বের করার চেষ্টায় মানুষের সফলতা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান ও দর্শনে যে শাস্ত্র এই উপকারী পথও পদ্ধতির সন্ধান দেয় তাকে যুক্তিবিদ্যা বলে। আর বিচারকার্যে সত্যান্বেষায় পথ নির্দেশ করে 'সাক্ষ্য'। যুক্তিবিদ্যা যেমন সত্য অন্বেষণের সঠিক পথ প্রদর্শনের চেষ্টা করে তেমনি 'সাক্ষ্য' বিচারের সময় কতদূর বিবেচনার এলাকা সম্প্রসারিত করতে হবে এবং কোন এলাকা বর্জন করতে হবে তা নির্দেশ দিয়ে সত্য উদঘাটনে সহায়তা করে। যুক্তিবিদ্যা মানসিক শৃঙ্খলানুবর্তিতা শিক্ষা দেয় এবং যুক্তি বিন্যাস শক্তিকে প্রয়োজনীয় সীমায় দন্ধ করে তা শাণিত ও উন্নত করে। ঠিক একইভাবে 'সাক্ষ্য' বিচারের সময় কোন কোন শ্রেণীর লোকের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য তা নির্দেশ করে এবং গ্রহণযোগ্য বিষয় কিভাবে প্রমাণ করতে হবে তার নির্দেশনা প্রদান করে এবং প্রমাণ কিভাবে আদালতে উপস্থাপন করতে হবে তার নির্দেশ প্রদান করে বিচার ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করে।

বিচার কার্যের উদ্দেশ্য সত্য প্রতিষ্ঠা হলেও সত্যের অন্বেষণ এখানে ব্যাপক পরিধির মধ্যে বিস্তৃত নয়। বিচারকার্যের সময় যে প্রশ্ন উত্থিত হয় সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য নেহায়েত যে পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করা জরুরি, বিচারের সময় তার সীমা অতিক্রম করা নিষেধ। কেননা যারা বিচার করেন

তাদের সময় অসীম নয়, যারা বিচারপ্রার্থী তাদের শক্তি ও ধৈর্য কোনটাই অপরিসীম নয় তাই বাধ্য হয়েই বিচারকালে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সকলকে আবদ্ধ থাকতে হয়। তদুপরি সব কথা বা বিষয়ই জানতে চাওয়া যায় না। সব কথা সকলে জানলে দেশের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই যে বিষয় জানা যাবে না তারও সীমা 'সাক্ষ্য' টেনে দেয়।[৭]

মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য পরোপকার। আর পরোপকার করতে হলে ঝুঁকি নিতে হয়। এ ঝুঁকি কখনো জীবনকেও বিপন্ন করে তোলে। তথাপি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় যুগে যুগে যাঁরা বিশাল অবদান রেখে গেছেন তাঁদের ত্যাগের তুলনা নেই। এ উপকার সাধনে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদান ও সাক্ষীর ভূমিকা অপরিসীম।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষ্যদান একটি অপরিহার্য উপাদান। সাক্ষ্যদান সাক্ষীদের ওপর অবশ্য কর্তব্য (ফরয)। আর বাদী যখন তাদের কাছে সাক্ষ্য প্রদানে দাবি জানায় তখন তাদের সাক্ষ্য গোপন রাখার কোন অধিকার নেই।[৮] আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে।'[৯]

'তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেউ তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী। তোমরা যা করো আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।'[১০]

'আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করো।'[১১]

আয়াতে বাদীর পক্ষ থেকে সাক্ষী তলবের শর্তারোপ করা হয়েছে। কেননা সাক্ষ্য হলো তার প্রাপ্য হক প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি। সুতরাং অন্যান্য 'হক'-এর ন্যায় এটাও তার দাবি করার ওপর নির্ভর করে। তবে হদ্দের আওতাভুক্ত যেসব বিষয় সরাসরি আল্লাহর অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে অবহিত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে সাক্ষ্য দিতেও পারে এবং নাও দিতে পারে। যেমন চার ব্যক্তি দু'জন নারী-পুরুষকে কুকর্মে লিপ্ত দেখলো। এক্ষেত্রে তারা ঘটনাটি ইচ্ছা করলে গোপন রাখতে পারে। রসূল স. ব্যভিচারের সাক্ষ্যদান সম্পর্কে সাহাবী হায্যাল রা.-কে বললেন, যদি তুমি গোপন করে রাখতে, তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হতো।'[১২]

সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষ্য ও সাক্ষ্যদানের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

সাক্ষ্যদান পদ্ধতি

সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। যেমন-

১. শুনানির দিন বাদী ও বিবাদী আদালতে উপস্থিত থাকলে বাদী তার সাক্ষীদের পরিচয় করিয়ে দিবে ও পর্যায়ক্রমে নির্দেশ করবে এবং সেই পরিচিতি ও পর্যায়ক্রম অনুসারে আদালত সাক্ষীগণকে সাক্ষ্য প্রদান করতে আহ্বান জানাবে।

২. বিবদমান বিষয় জীবজন্তু বিষয়ক হলে সাক্ষ্য প্রদান কালে তার সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে হবে এবং সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৩. সাক্ষীগণ আদালতে উপস্থিত হয়ে বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে তারা কোন পক্ষের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করবে তা নিবেদন করবে এবং তাদের পরিচয় পেশ করবে।

৪. বাদী অথবা বিবাদী আদালতে অনুপস্থিত থাকলে অথবা তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে এবং তাদের প্রতিনিধি (ওয়াকীল অথবা ওসী) উপস্থিত থাকলে সে ক্ষেত্রেও বাদী ও বিবাদীর নামোল্লেখ করে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে।

৫. মৃতের ওয়ারিসের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মৃতের সাথে ওয়ারিসের কী ধরনের সম্পর্ক তা সাক্ষীগণকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে হবে।

৬. বিবদমান বিষয় জায়গা-জমি ও বাড়ি-ঘর হলে তার চৌহদ্দীর বিবরণ প্রদান করতে হবে।

৭. সাক্ষ্য প্রদানের সময় দিন-ক্ষণ-সময়-সংখ্যা ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। আর তা এভাবে বলতে হবে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই নির্দিষ্ট বস্তুর মালিক অমুক'। যেমন, কেউ যদি কারো কাছে দশ টাকা পাবে বলে দাবি করে আর সাক্ষী এভাবে সাক্ষ্য দেয় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই বিবাদীর ওপর এই বাদীর দশ টাকা পাওনা আছে, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে।[১৩]

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য

আল কুরআনের দৃষ্টিতে মামলার সাক্ষীরা মূলত আল্লাহর সাক্ষী, কোন বিশেষ পক্ষের নয়। তাদের এ সাক্ষ্যদান হতে হবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থাৎ বিচারক ও সাক্ষী সকলেরই সম্মুখে একটি মাত্র লক্ষ্য থাকবে তা হচ্ছে, মামলার সুবিচার। অতএব তারা কোন বিশেষ পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য যেন সাক্ষ্য না দেয় বা তারা যেন এমনভাবে সাক্ষ্য না দেয়, যার ফলে সুবিচার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয় কিংবা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এজন্য কোন প্রকার লোক সাক্ষী হবে সে বিষয়ে ইসলামে কতিপয় জরুরি শর্তারোপ করা হয়েছে। শর্তসমূহ হচ্ছে :

১. **মুসলিম হওয়া :** কোন মুসলিমের মোকদ্দমায় কোন অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে অমুসলিমরা একে অপরের জন্য সাক্ষী হতে পারবে।[১৪]

ইমাম আযম আবূ হানীফা র.-এর মতে সফররত অবস্থায় কোন মুসলিমের ব্যাপারে কেবল ওসিয়্যতের ক্ষেত্রে অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এ বিষয়ে হযরত শুরাইহ, ইবরাহীম আল-নাখয়ী এবং আওযায়ী র. ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১৫] তাঁরা দলিল হিসাবে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন :

'হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়্যত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে নামাযের পর তাদের অপেক্ষমান রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমরা এর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করবো না যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করবো না, করলে অবশ্যই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। যদি এটা প্রকাশ পায় যে, তারা দু'জন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তবে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য হতে নিকটতম দু'জন তাদের স্থলবর্তী হবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য হতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি, করলে অবশ্যই আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'[১৬]

হানাফী আলিমগণ আরো বলেন, অমুসলিমদের পারস্পরিক সাক্ষ্য প্রদান জায়েয আছে। কেননা নবী স. ইয়াহূদীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে দু'জন ইয়াহূদীকে ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করেছিলেন।[১৭]

ইমাম খাত্তাবী র. বলেন, বিশেষত সফররত অবস্থায় মুসলিমের পক্ষে অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[১৮]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, নিরুপায় অবস্থা ব্যতীত মুসলিমের পক্ষে অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১৯]

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক র. বলেন, কোন অবস্থায়ই মুসলিমের পক্ষে অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় তাঁরা আরো বলেন, যিম্মীর সাক্ষ্য মুসলিম কিংবা কাফির কারো ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়।[২০]

২. ন্যায়পরায়ণ হওয়া : ন্যায়পরায়ণতা (আদালত)-এর একাধিক সংগা রয়েছে। এ পর্যায়ে কয়েকটি অভিমত প্রদত্ত হলো :

ক. 'যার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ নেই সে ন্যায়পরায়ণ।'[২১]

খ. 'যার সৎ কাজ বেশি এবং অসৎ কাজ কম।'[২২]

গ. 'যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ বর্জন করে চলে অবশ্য পালনীয় ফরয আদায় করে এবং যার খারাপ কাজের তুলনায় সৎ কাজই প্রসিদ্ধ সে ন্যায়পরায়ণ।' ইমাম পখরুদ্দীন আলী আল-বাযদাবী র. এ অভিমত দিয়েছেন।[২৩]

ঘ. 'যে ব্যক্তির সামগ্রিক লেনদেনে সৎ বলে বিবেচিত, যার অসৎ কাজের তুলনায় সৎ কাজই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যে মিথ্যাবাদী কিংবা প্রতারক বা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হিসেবে কুখ্যাত নয় সে ন্যায়পরায়ণ।'[২৪] আল্লাহ তাআলা বলেন : 'হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।'[২৫]

মহানবী স. বলেন, 'বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতকিনী ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'[২৬]

ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য তওবা সাপেক্ষে গৃহীত হবে। এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে ইমাম আযম আবূ হানীফা র. বলেন, কোন ফাসিকের অপকর্ম যদি কারো বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ তথা কাযাফ বিষয়ক হয়, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন : 'যারা সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, কারণ এরাই সত্যত্যাগী।[২৭]

৩. বোধশক্তিসম্পন্ন হওয়া : কোন ব্যক্তি বোধশক্তিসম্পন্ন না হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাক্ষী হওয়ার অর্থই হলো ঘটনা অনুধাবন করা এবং তা স্মরণ রাখা। আর এ কাজে

বোধশক্তি ও স্মৃতিশক্তির বিকল্প নেই। কাজেই সাক্ষীকে বোধশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২৮]

নবী স. বলেছেন : 'তুমি (ঘটনা সম্পর্কে) দিবালোকের ন্যায় অবহিত থাকলেই সাক্ষ্য প্রদান করবে, অন্যথায় বিরত থাকবে।'[২৯]

৪. বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হওয়া : সাক্ষীকে বালেগ হতে হবে। এ বিষয়ে ফিকহবিদগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই নাবালেগ বোধশক্তি সম্পন্ন হলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তার সাক্ষ্য বিশ্বাস অর্জনের জন্য সহায়ক নয়, অথচ বিচার-ফয়সালা ও সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বালেগ হওয়াকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।[৩০]

হাদীসে আছে, 'তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে : নাবালেগ-যতক্ষণ বালেগ না হয়, নিদ্রিত যতক্ষণ জাগ্রত না হয় এবং পাগল-যতক্ষণ উন্মাদনামুক্ত না হয়।'[৩১]

৫. 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' শব্দযোগে সাক্ষ্যদান : সাক্ষীকে 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' শব্দযোগে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। 'আমি বর্ণনা করছি', 'আমি তথ্য প্রদান করছি', 'আমি অবহিত করছি' ইত্যাদি শব্দ বা অনুরূপ অর্থবোধক শব্দ দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করা যাবে না।[৩২]

যেমন আল্লাহর একত্ববাদ এবং নবী স.-এর রিসালাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য হচ্ছে : 'এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ স. তাঁর বান্দা ও রসূল।'[৩৩]

৬. সাক্ষীর সংখ্যা : ব্যভিচার (যেনা) ও ব্যভিচারের অপবাদ (কাযাফ) সম্পর্কিত মোকদ্দমা ব্যতীত অন্য সকল মোকদ্দমায় কমপক্ষে দু'জন পুরুষ সাক্ষী প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সাক্ষীদের মধ্যে যাদের ওপর তোমরা সন্তুষ্ট তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক' স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে।'[৩৪]

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে : 'এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।'[৩৫]

বাদীকে লক্ষ্য করে মহানবী স. বলেন, 'তোমরা দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করো অন্যথায় তোমাকে তার (বিবাদীর) শপথের ওপর নির্ভর করতে হবে।'[৩৬]

তবে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য হলে বিচারক তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফয়সালা দিতে পারেন। কেননা হাদীসে : 'হযরত উমারা ইবনে খুযাইমা র. বলেন, তার চাচা এবং নবী স.-এর সাহাবী তার নিকট বর্ণনা করে বলেন, একবার নবী এক বেদুঈনের নিকট থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। এরপর তিনি তা নিয়ে রওয়ানা দেন যাতে তিনি তার ঘোড়ার মূল্য পরিশোধ করতে পারেন। এ সময় নবী স. দ্রুত চলে যেতে চাচ্ছিলেন কিন্তু বেদুঈন লোকটি দেরি করে ফেলে। এমন সময় কতিপয় লোক তার কাছে এসে ঘোড়ার মূল্য জিজ্ঞেস করে অথচ তারা জানতো না যে, নবী স. সেটি ক্রয় করেছেন। তখন বেদুঈন লোকটি নবী স.-কে ডেকে বলে আপনি যদি এ ঘোড়া ক্রয় করতে চান, তবে ক্রয় করুন, অন্যথায় আমি এটি অন্যত্র বিক্রয় করে দেবো। তখন নবী স. বলেন :

আমি কি এ ঘোড়াটি তোমার নিকট থেকে ক্রয় করিনি? সে বলল, না, আল্লাহর শপথ! নবী স. বললেন : আমি তোমার ঘোড়া ক্রয় করিনি কিভাবে, আমি তো তোমার নিকট থেকে তা ক্রয় করেছি। সে বললো, তাহলে আপনি সাক্ষ্য পেশ করুন। একথা শুনে খুযাইমা ইবনে সাবিত রা. বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তার নিকট থেকে ঘোড়াটি ক্রয় করেছেন। তখন নবী স. খুযাইমা রা.-কে বললেন, তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছো কিভাবে (কারণ ক্রয়কালে তো তুমি উপস্থিত ছিলে না)? জবাবে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ কারণে যে, আমি আপনাকে সত্যবাদী মনে করি। অতএব নবী স. খুযাইমা রা.-এর সাক্ষ্যকে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান ঘোষণা করেন।[৩৭]

৭. বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া : সাক্ষীর সরাসরি কথা বলার সামর্থ্য থাকতে হবে। বাকশক্তিহীন ব্যক্তি সাক্ষী হওয়ার যোগ্য নয়। এ বিষয়ে হানাফী, শাফেঈ ও হাম্বলী ফকীহগণ একমত।[৩৮] অবশ্য মালিকী মাযহাব মতে, বাকশক্তিহীনের সুস্পষ্ট ইশারা-ইংগিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৩৯]

৮. ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া : কোন ব্যক্তি যে ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে সেই ঘটনা তাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে হবে। অতএব অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সে বাদী ও বিবাদীকে সনাক্ত করতে অপারগ। কণ্ঠস্বরের অনুসরণ করে সনাক্ত করা কখনো সম্ভব হলেও তা সন্দেহমুক্ত নয়। ইমাম শাফেঈ র. বলেন, যেসব ক্ষেত্রে সরাসরি দর্শনের প্রয়োজন হয় না সেসব ক্ষেত্রে অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৪০]

৯. সাক্ষীগণের বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া : সাক্ষীগণের পরস্পরের অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং যে বিষয়ের অনুকূলে সাক্ষ্য দিবে তার সাথেও সংগতিপূর্ণ হতে হবে, অন্যথায় সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবূ হানীফা র. বলেন, শব্দগত ও ভাবার্থগত উভয় দিক থেকে সাক্ষ্যের মধ্যে পূর্ণ মিল থাকতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ র. বলেন, ভাবার্থগত মিল থাকাই যথেষ্ট।[৪১]

১০. আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান : সাক্ষীগণকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত হয়ে বিচারকের সামনে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। কারণ আদালত সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করে এবং তার রায়ের দ্বারা সাক্ষ্যের কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪২]

১১. সাক্ষীর কোন পক্ষের শত্রু না হওয়া : সাক্ষী কোন পক্ষের শত্রু হতে পারবে না। কেননা কোন ব্যক্তি তার শত্রুর বিপক্ষে সাক্ষ্যদানের সুযোগ পেলে সে যে তার সুযোগ নিবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। কুরআনে আছে : 'মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে'।[৪৩]

১২. সাক্ষ্যদান নিঃস্বার্থ ও প্রভাবমুক্ত হওয়া : সাক্ষীর সাক্ষ্যদান হবে নিঃস্বার্থ, প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ। সাক্ষী আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সত্য ঘটনা ব্যক্ত করবে। সাক্ষ্যদানের অন্তরালে কোন স্বার্থ থাকতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন : 'আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করো।'[৪৪]

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

সাক্ষ্যদান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে তার সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে বাদী-বিবাদীর ভাগ্য নিরূপিত হয়ে থাকে। সুতরাং সুষ্ঠু বিচার-ফয়সালার লক্ষ্যে কে

সাক্ষ্যদানের যোগ্য আর কে যোগ্য নয় তা জেনে নেয়া একান্ত প্রয়োজন। কাজেই যারা সাক্ষ্যদানে অযোগ্য তাদের বিবরণ নিম্নরূপ :

১. অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য : অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সে সাক্ষ্যদানকালে বাদী ও বিবাদীকে সনাক্ত করতে অপারগ। যেমন, হত্যাকাণ্ড, অপহরণ, ব্যভিচার, মদ্যপান, আত্মসাৎ বা অনুরূপ অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার স্থান ও অপরাধীকে সনাক্ত না করে সাক্ষ্যদান সম্ভব নয়।[৪৫]

ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেন, ঘটনা সংঘটনকালে কোন চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[৪৬] ইমাম শাফেয়ী র. ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৪৭] ইমাম শাফেয়ী র. ও তার অনুসারী ইমামগণ বলেন, পাঁচটি বিষয় ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তা হচ্ছে : বংশ-প্রমাণ, মৃত্যুর সংবাদ, মালিকানা প্রতিষ্ঠা, কোন বিষয়ের ভাষ্য এবং অন্ধ ব্যক্তির অন্ধ হওয়ার পূর্বেকার ঘটনাবলী সম্পর্কে সাক্ষ্যদান।[৪৮]

ইমাম মালিক র. ও ইমাম আহমাদ র. বলেন, অন্ধ ব্যক্তি যদি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন হয় এবং যাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে তাদের কণ্ঠস্বর বুঝতে পারে তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। বিবাহ, তালাক, ক্রয়-বিক্রয়, বংশ প্রমাণ, ওয়াকফ, কোন কিছুর মালিকানা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারে অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[৪৯]

ইবনুল কাসিম র. বলেন, আমি অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ইমাম মালিক র.-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৫০] পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা র. বলেন, একথা মৌলিকভাবে যথার্থ যে, অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[৫১]

তবে নিম্নবর্ণিত হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

'নবী স. বলেছেন : বিলাল তো রাত থাকতেই আযান দেয়। সুতরাং ইবনে উম্মে মাকতূম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে থাকো অথবা বর্ণনাকারী বলেছেন, যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান শুনতে পাও। (বর্ণনাকারী বলেন) ইবনে উম্মে মাকতূম রা. ছিলেন একজন অন্ধ লোক, লোকেরা যতক্ষণ তাকে না বলতো যে, সকাল হয়েছে, সকাল হয়েছে ততক্ষণ তিনি আযান দিতেন না।'[৫২]

২. স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য : পিতামাতার অনুকূলে সন্তানের, সন্তানের অনুকূলে পিতামাতার, স্বামীর অনুকূলে স্ত্রীর, স্ত্রীর অনুকূলে স্বামীর এবং এক অংশীদারের অনুকূলে অপর অংশীদারের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তাদের মধ্যে ভরণপোষণ, মীরাস ও অনুরূপ স্বার্থ জড়িত রয়েছে। কাজেই তারা নিঃস্বার্থ সাক্ষী নয়।[৫৩]

নবী স. বলেছেন, 'পিতার পক্ষে সন্তানের এবং সন্তানের পক্ষে পিতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'[৫৪]

৩. নাবালেগের সাক্ষ্য : নাবালেগের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে সকল মাযহাবের ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেন, এমনকি সে বোধশক্তিসম্পন্ন হলেও নয়।[৫৫] তবে তথ্য উদঘাটনে তাদের বক্তব্য আদালতের বিবেচনায় আসতে পারে!

৪. অমুসলিম নাগরিকের সাক্ষ্য : মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যিম্মীদের (অমুসলিম নাগরিকের) সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে ফকীহগণ সর্বসম্মত অভিমত দিয়েছেন। কারণ সাক্ষ্য হচ্ছে এক ধরনের অভিভাবকত্ব। আর অমুসলিম কখনো মুসলমানের অভিভাবক হতে পারে না। কুর'আন মাজীদে আছে : 'আল্লাহ মুমিনদের ওপর কাফিরদের কোন পথই অবশিষ্ট রাখেননি।'[৫৬]

হাম্বালী ফকহীগণ একটি মাত্র ক্ষেত্রে মুসলমানের বিষয়ে অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে বলে অভিমত দিয়েছেন। তা হচ্ছে, সফররত অবস্থায় যদি কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসলিম সাক্ষী পাওয়া না যায়, তবে সেক্ষেত্রে দু'জন অমুসলিমকে সাক্ষী বানানো যাবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন : 'হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সফরে থাকলে কিংবা তোমাদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তোমাদের ব্যতীত অন্য লোকদের মধ্য হতে সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে নামাযের পর তাদেরকে অপেক্ষমান রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমরা এর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করবো না যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করবো না, করলে অবশ্যই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'[৫৭]

তবে অমুসলিমদের পারস্পরিক ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, তারা পরস্পর ভিন্ন ধর্মের (আদর্শের) অনুসারী হলেও। আল্লাহ তাআলা বলেন : 'যারা কাফির তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক।'[৫৮]

এছাড়া তাদের মধ্যেও যে বিশ্বস্ত লোক আছে তা কুরআন মাজীদ স্বীকার করে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন : 'আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোকও আছে যাদের নিকট আপনি সম্পদের বিরাট স্তূপও আমানত রাখলে তারা তা আপনাকে ফেরত দিবে।'[৫৯]

দুই ইয়াহুদ্ নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে ইয়াহূদীরা তাদেরকে মহানবী স.-এর নিকট নিয়ে আসে। মহানবী স. তাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করেন। তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করলে তিনি তাদের উপর ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করেন।[৬০]

৫. সাহাবা, তাবিঈ ও সালফে-সালেহীনকে গালমন্দকারীর সাক্ষ্য : রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবী, তাবিঈ এবং মুজতাহিদ ফকীহ ও ইমামগণকে যারা গালমন্দ করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[৬১] হাদীস আছে : 'রসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। কেননা সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণও ব্যয় করে তথাপি তাদের ব্যয়িত এক অথবা অর্ধ মুদ্দ ১১ ছটাকের সমপরিমাণ (বস্তু) ব্যয়ের সমান পর্যন্ত তোমরা পৌঁছতে পারবে না।[৬২]

৬. মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য : যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হিসাবে সমাজে কুখ্যাত তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সে আল্লাহ ভীতিশূন্য ব্যক্তি। তবে ভুলবশত মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে তওবা করে তওবা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আরো উল্লেখ্য যে, প্রতারকের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য

নয়।[৬৩] এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে আছে : 'যার অন্তরকে আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে, তুমি তার আনুগত্য করো না।'[৬৪]

নবী স. বলেছেন, 'মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার পদদ্বয় (কিয়ামতের দিন) একটুও নড়বে না যতক্ষণে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের ফয়সালা না করবেন।[৬৫]

মহানবী স. বলেন, 'মিথ্যা সাক্ষ্যদান আল্লাহর সাথে শরীক করার সমতুল্য।[৬৬]

হযরত উমর রা.-এর খিলাফতকালে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মুখমণ্ডলে কালিমা লেপন করা হতো এবং বেত্রাঘাত করা হতো। বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর রা. সিরিয়ার গভর্নরের নিকট এ মর্মে পত্র লিখেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে যেন চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হয়, তার চেহারা কালিমাযুক্ত করা হয়, তার মাথা মুড়িয়ে দেয়া হয় এবং তাকে দীর্ঘমেয়াদে বন্দী রাখা হয়।[৬৭]

৭. শহরবাসীর পক্ষে গ্রামবাসীর সাক্ষ্য : ইমাম আহমাদ ও তাঁর একদল অনুসারী, আবূ উবাইদ ও ইমাম মালিক র.-এর এক বর্ণনায় আছে, শহরবাসীর পক্ষে গ্রামবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[৬৮]

তাঁরা দলিল হিসেবে নিম্নবর্ণিত হাদীস পেশ করেন : 'শহরবাসীর পক্ষে গ্রামবাসীর সাক্ষ্য প্রদান জায়েয নয়।'[৬৯]

কারণ গ্রাম্য লোকেরা সাধারণত সহজ-সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে। আর শহরের অধিবাসীরা অধিক ধূর্ত ও চালাক প্রকৃতির হয়ে থাকে। এ কারণে তারা তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে না। এছাড়া আরো বলা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রাম্য লোকেরা মূর্খ ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, আর শহরের লোকেরা হয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। তাই গ্রাম্য মূর্খ লোকদের সাক্ষ্য শহরবাসীদের পক্ষে জায়েয নয়।

তবে বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে যদি গ্রাম্য ও শহরবাসীর ন্যায়নিষ্ঠ, সততা একই পর্যায়ের হয় তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণে কোন অন্তরায় থাকে না। এ অভিমত ইমাম শাফিয়ী র. ও জমহুর আলিমগণের। আরো উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে একথা বলা যায় না যে, গ্রাম্য লোক মানেই মূর্খ। কেননা নবী স. রমযানের নতুন চাঁদ ওঠার বিষয়ে গ্রাম্য লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী স.-এর কাছে এক গ্রাম্য লোক এসে বললো, আমি রমযানের (নতুন) চাঁদ দেখেছি। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল? সে বললো, হ্যাঁ। নবী স. বললেন : হে বিলাল! লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন আগামীকাল রোযা রাখে।[৭০]

৮. দাসের পক্ষে মনিবের সাক্ষ্য : দাসের পক্ষে মনিবের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা হাদীসে আছে : 'মনিবের পক্ষে দাসের এবং দাসের পক্ষে মনিবের ও মালিকের পক্ষে শ্রমিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'[৭১]

শর্তসাপেক্ষে যাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য

১. পাপাচারী ব্যক্তি তওবা করে সংশোধন হলে এবং তার মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠা ও সততার ভাবধারা সৃষ্টি হলে এবং সে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[৭২]

২. ব্যভিচারজাত ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হলে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ তার জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীর পাপাচারের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। যেমন কোন মুসলিম ব্যক্তির পিতামাতা কাফির হওয়া সত্ত্বেও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে।[৭৩]

৩. নপুংসক ও খুনছা (উভয় লিঙ্গধারী)-এর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। কারণ সে হয়ত নারী অথবা পুরুষ। আর শরীআতে নারী-পুরুষ উভয়ের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য।[৭৪]

৪. যেনা, চুরি বা শরাব পানের অপরাধের শাস্তি ভোগের পর অপরাধী তওবা করে সংশোধিত হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।[৭৫]

৫. সরকারি কর্মচারীদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য, যদি তারা সৎ হয় এবং যালিম ও স্বৈরাচারী না হয়।[৭৬]

সাক্ষ্য প্রত্যাহার

কোন সাক্ষী তার সাক্ষ্যের দ্বারা আদালতে যা প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার সেই সাক্ষ্য স্বেচ্ছায় আদালতের সামনে প্রত্যাহার করাকে 'সাক্ষ্য প্রত্যাহার' (রুজু আনিশ-শাহাদাহ) বলে। সাক্ষী তার সাক্ষ্য এভাবে প্রত্যাহার করবে, 'আমি যে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলাম তা প্রত্যাহার করলাম।' অথবা বলবে, 'আমি ইতিপূর্বে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছি তা অসত্য।' অথবা বলবে, 'আমি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছি।' এ সাক্ষ্য প্রত্যাহৃত হবে আদালতে, বিচারক পরিবর্তন হলে তাতে কিছু যায় আসে না। আদালতের বাইরে কিংবা অন্যত্র সাক্ষ্য প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাক্ষী অন্যত্র সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে বিবাদী তাকে আদালতে হাযির করলে এবং সেখানে সে সাক্ষ্য প্রত্যাহারের বিষয় অস্বীকার করলে কিছুই করার নেই, এর জন্য শুনানির ব্যবস্থাও নেই এবং সাক্ষীকে শপথও করানো যাবে না। তবে যে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে সে আদালত ব্যতীত অন্য আদালতে সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তা কার্যকর হবে।[৭৭]

আদালত কর্তৃক রায়দানের পর, রায় কার্যকর করার পূর্বে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা হলে সাক্ষীগণের কোন আর্থিক দণ্ড হবে না। কারণ রায়দানের পূর্ব পর্যন্ত বিবাদীর ওপর কোনরূপ দায় বর্তায় না। তবে এক্ষেত্রেও আদালত বিবেচনা করলে সাক্ষীগণকে সাক্ষ্য প্রত্যাহারের প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারে।[৭৮]

আদালত কর্তৃক রায় প্রদানের পর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা হলে এবং মোকদ্দমা মাল সম্পর্কিত বিষয়ে হলে, সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অবশ্য সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী মিথ্যাবাদী বিবেচিত হলে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের কারণে আদালতের বিবেচনা অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য হবে।[৭৯]

আদালত কর্তৃক রায় প্রদানের পর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা হলে এবং মোকদ্দমা মানব জীবনের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে, সাক্ষ্য প্রত্যাহারীকারীকে অপরাধের

ধরন অনুযায়ী দিয়্যাত তথা আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান কতে হবে। যেমন দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলো যে, অমুক অমুককে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হত্যা করেছে। অতঃপর আদালত তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করলো ও তা কার্যকরও হলো। অতঃপর সাক্ষীদ্বয় আদালতে উপস্থিত হয়ে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলো। এক্ষেত্রে সাক্ষীদ্বয় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিবারকে দিয়্যাত প্রদান করবে এবং আদালত বিবেচনা করলে তাদেরকে অতিরিক্ত শাস্তিও দিতে পারে।[৮০]

তবে শাস্তি কার্যকর করার পূর্বে সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তাদের উপর দিয়্যাত ধার্য হবে না। তবে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে হয়রানি করার জন্য আদালত তার বিবেচনা অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীকে ভিন্নতর শাস্তি প্রদান করতে পারে।[৮১]

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ

মাল সম্পর্কিত মোকদ্দমার ক্ষেত্রে আদালত বিবাদীকে যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণের নির্দেশ প্রদান করেছে, সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীদের ওপর সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে।[৮২]

মানবদেহ ও মানব জীবনের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ সম্পর্কিত মোকদ্দমার ক্ষেত্রে অপরাধীকে যে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীদের ওপর সেই পরিমাণ দিয়্যাত ধার্য করা হবে।[৮৩]

যেনা-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক রায় প্রদান ও দণ্ড কার্যকর করার পূর্বে অথবা পরে চারজন সাক্ষীর সকলে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তারা কযফ-এর দণ্ড ভোগ করবে।

রায় প্রদান করার পর এবং দণ্ড কার্যকর করার পূর্বে এক বা একাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলেও তাদেরকে কযফের দণ্ড ভোগ করতে হবে। আদালত কর্তৃক ঘোষিত দণ্ড কার্যকর করার পর যে সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করবে কেবল সেই কযফের দণ্ড ভোগ করবে।

ঘোষিত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলে এবং তা কার্যকর করার পর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা হলে সাক্ষীগণের দিয়্যাত প্রদানও অপরিহার্য হবে।

রায় প্রদানের পর এবং তা কার্যকর করার পূর্বে কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলেও ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর মতে, সাক্ষীগণের সকলে কযফের দণ্ড ভোগ করবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ র.-এর মতে কেবল সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী কযফের দণ্ড ভোগ করবে।[৮৪]

কোন বস্তু প্রকৃত মূল্যে অথবা অধিক মূল্যে বিক্রয় করার সাক্ষ্য প্রদানের পর তা প্রত্যাহার করা হলে সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে যথার্থ মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করার সাক্ষ্যদানের পর তা প্রত্যাহার করা হলে ক্ষতির সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৮৫]

কোন বস্তু প্রকৃত মূল্যে অথবা কম মূল্যে ক্রয় করার সাক্ষ্যদানের পর পুনরায় তা প্রত্যাহার করা হলে সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীগণকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করার সাক্ষ্য প্রদানের পর তা প্রত্যাহার করা হলে ক্ষতির সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ক্রেতা কর্তৃক কিস্তিতে ক্রয়কৃত বস্তুর মূল্য পরিশোধের দাবি করলে এবং তার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদানের পর তা প্রত্যাহার করা হলে বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীর নিকট হতেও সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করতে পারে অথবা ক্রেতার নিকট হতে কিস্তিতে তা আদায় করতে পারে, তবে সে একজনের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করলে অপরজন দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

কোন ব্যক্তি আদালতে এই মর্মে দু'জন সাক্ষী পেশ করলো যে, মৃত ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত মালের এক তৃতীয়াংশ তার অনুকূলে ওসিয়ত করেছেন, এই ক্ষেত্রে বিচারক তার রায় প্রদান ও তা কার্যকর করার পর সাক্ষীগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে এক-তৃতীয়াংশ মালের ক্ষতিপূরণ প্রদানে সাক্ষীগণকে বাধ্য করা যাবে।

অনুরূপভাবে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি মৃতের ওয়ারিস সাব্যস্ত হলে, সাক্ষ্য প্রত্যাহারের পর ওয়ারিস হিসাবে সে যা গ্রহণ করেছিল তা প্রকৃত ওয়ারিসগণকে ফেরত দানে বাধ্য হবে।[৮৬]

সাক্ষীর সংখ্যা

শরীঅতের দৃষ্টিতে মানব জীবনের সকল ঘটনার গুরুত্ব সমান নয়। কাজেই প্রতিটি ব্যাপারে সাক্ষীর সংখ্যাও এক সমান নয়। বরং কখনো কখনো সাক্ষীর সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে। যেমন, যেনা-ব্যভিচারের সাক্ষ্য। এক্ষেত্রে চারজন চাক্ষুস পুরুষ সাক্ষী অপরিহার্য। কুরআন মাজীদে আছে : 'তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন পুরুষ সাক্ষ্য তলব করবে।'[৮৭]

অনুরূপভাবে কেউ যদি সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয় সেক্ষেত্রেও চারজন সাক্ষী উপস্থিত করা অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা বলেন : 'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষ্য উপস্থিত না করে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না।'[৮৮]

অপর এক আয়াতে আরো আছে : 'তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী।'[৮৯]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি নিজকে দরিদ্র লোক ঘোষণা দিয়ে যাকাতপ্রার্থী হয় তবে তার সপক্ষে তিনজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করা ব্যতীত তার দাবি গৃহীত হবে না।[৯০] তিনি এ ব্যাপারে কাবীসা ইবনে মুখারিক আল-হিলালী র. বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসাবে পেশ করেন। তিনি বলেন, 'আমি নবী স.-এর কাছে এসে আমার ঋণের বোঝা বহন করার বিষয়ে জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলাম। নবী স. বললেন, তুমি আমাদের কাছে অবস্থান করো, যতক্ষণ যাকাতের মাল না আসে। যাকাতের মাল আসলে আমি তা থেকে তোমাকে কিছু দানের নির্দেশ দিবো। অতঃপর তিনি আরো যেনা-ব্যভিচার ব্যতীত অপরাপর বিষয়ে নারী ব্যতীত দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেননা হুদূদ বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণ সর্বসম্মত অভিমত দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা তালাক ও রুজআতের বিষয়ে বলেছেন, 'আর তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।'[৯১]

নবী স. আশআই ইবনে কাইস রা.-কে বলেছিলেন, 'তুমি দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করো অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শপথ করো।[৯২]

কখনো কখনো অবস্থা এমন হয় যে, সাক্ষী হিসাবে দু'জন পুরুষ পাওয়া দুরূহ। এমতাবস্থায় একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কুরআন মাজীদে আছে : 'সাক্ষীদের মধ্যে

যাদের ওপর তোমরা রাযী তাদের মধ্য হতে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দু'জন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকদের একজন ভুল করলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে।'[৯৩]

হানাফী ফিকহবিদগণের মতে, ধন-সম্পদ, বিবাহ-শাদী, তালাক ইত্যাদি বিষয়ে দু'জন নারী ও একজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৯৪] ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম মালিক র.-এর মত হলো, এ পর্যায়ে কেবল সম্পদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গৃহীত হবে, শরীঅতের আহকাম সংক্রান্ত বিষয়ে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।[৯৫]

এটা একটি মূলনীতি, কোন ব্যাপারে বিচারক যদি একজন মহিলা কিংবা একজন পুরুষ ব্যতীত কোন সাক্ষ্য না পান এবং তার সাক্ষ্যের ওপর আস্থাশীল হতে পারেন তবে ইচ্ছা করলে তিনি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন। যেমন মহিলাদের ক্ষেত্রে কোন নারীর কুমারীত্ব, দোষত্রুটি ইত্যাদি বিষয়ে কেবল মহিলার সাক্ষ্যই গৃহীত হবে। আর একজন পুরুষের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। যেমন খুযাইমা ইবনে সাবিত রা.-এর সাক্ষ্য দু'জনের সাক্ষ্যের অনুরূপ গণ্য করা হয়েছে।[৯৬]

এ বিষয়টি কেবল খুযাইমা রা.-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, উবাই ইবনে কা'ব রা. প্রমুখ যদি কারো পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন অবশ্যই তা গৃহীত হতো। যেমন ইমাম আবূ দাউদ র. এ পর্যায়ে একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন, 'বিচারক যদি নিশ্চিত হন যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন সাক্ষী সত্যনিষ্ঠ তবে তিনি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করে রায় দিতে পারেন।'[৯৭]

কারো দুধপানের বিষয়ে যদি একজন মহিলা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা হযরত উকবা ইবনুল হারিস রা. উম্মে ইয়াহইয়া বিনতে আবূ ইহাব নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেন। অতৎপর এক কৃষ্ণকায় মহিলা এসে বললো, আমি এদের দু'জনকে দুধপান করিয়েছি। এ বিষয়ে উকবা রা. নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, তা হয় কিভাবে? বিষয়টি তাকে অবহিত করা হলো। উকবা রা. বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দিলে মহিলাটি অপর একজন পুরুষকে বিবাহ করে নেয়।[৯৮]

নারীর সাক্ষ্য

ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। তাই একমাত্র ইসলাম নারী ও পুরুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলাম নারীকে কোন অবস্থায় তুচ্ছ জ্ঞান করে না। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। বিচার-ফয়সালার সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রেও তাদের উপেক্ষা করেনি। নারীর সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে ইসলামের সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে :

ক. হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. হদ্দ ও কিসাস ব্যতীত অপরাপর সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

গ. বংশপ্রমাণ, দুধপান ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয় এবং নারীদের সাথে একান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

ইমাম যুহরী র. বলেন, 'রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর পরবর্তী দুই খলীফার যুগ হতে এই নীতি চলে এসেছে যে, হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'[৯৯]

ইসলামী শরীঅতে একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমান দু'জন নারীর সাক্ষ্য। একজন পুরুষের মোকাবিলায় দু'জন নারীর সাক্ষ্য বিষয়টি কারো মনে প্রশ্নের সৃষ্টি করতে পারে। তাই এর ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুরি মনে হয়।

ইসলামের বিধান হলো, দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। এতে প্রমাণিত হয় না যে, একজন নারী একজন পুরুষের অর্ধেকের সমান। মূলত এটা হলো একটি বিজ্ঞজনোচিত পদক্ষেপ। এর লক্ষ্য হলো, সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে সাক্ষ্যকে দোষমুক্ত করা। চাই সে সাক্ষ্য আসামীর পক্ষে হোক কিংবা ফরিয়াদীর পক্ষে হোক। প্রকৃতিগতভাবে নারী আবেগপ্রবণ। এ কারণে মামলার ঘটনা উপস্থাপনায় বিব্রত হওয়া তার পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়। তাই সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে আরো একজন নারীকে তার সহযোগী করে দেয়া হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে : 'স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে।'[১০০]

এটা নারী-পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য নির্দেশ করে নয়, বরং সাবধানতা ও সতর্কতার জন্যই এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে মামলার পক্ষবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

আদালতী কার্যক্রম অত্যন্ত জটিল, হাঙ্গামাপূর্ণ ও সওয়াল-জবাবের প্রশ্ন বানে আক্রমণ প্রতি আক্রমণে উত্তেজনাপূর্ণ। এরূপ একটি কার্যক্রমে দীন ইসলাম তার নারী সমাজকে পারতপক্ষে জড়িত করতে চায় না। যেখানেই একান্তই প্রয়োজন হয়েছে সেখানে তার সাথে তার সহযোগী রাখা হয়েছে।

তবে হদ্দ ও কিসাসের আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ হিংস্রতা আশ্রয়ী। নারীরা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এ জাতীয় ভয়াবহ অপরাধ চাক্ষুস দেখতে অভ্যস্ত নয়। এই ভয়াবহ দৃশ্য তাদের অচেতন করে ফেলে। তাই এক্ষেত্রে তাদেরকে সাক্ষী হওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে এসব অপরাধ কোন কারণে তা'যীরের পর্যায়ভুক্ত হলে সেক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন চুরির ক্ষেত্র অপরাধ হদ্দের পর্যায়ভুক্ত না হলে সে ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[১০১]

হদ্দ ও কিসাস ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে চাই তা আর্থিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক কি আর্থিক বিষয় বহির্ভূত হোক, পুরুষের সাথে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যেমন বিবাহ, তালাক, ওসিয়ত, ওয়াকফ, হেবা, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি।[১০২] নারীদের একান্ত গোপনীয় বিষয়ে এককভাবে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, এমনকি একজন নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। যেমন কোন নারী কুমারী কিনা, কোন নারীর ঋতুস্রাবের সময়কাল শেষ হয়েছে কিনা, সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে কিনা, যদি হয়ে থাকে তবে শিশু সন্তান শব্দ করে চিৎকার করেছে কিনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বৈধ।

নবী স. বলেছেন, 'যে সব বিষয়ের প্রতি পুরুষের দৃষ্টি পৌছান অসম্ভব সেসব ক্ষেত্রে শুধু নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।'[১০৩] সন্তানের পরিচয় নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ধাত্রী বা মহিলা চিকিৎসকের একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[১০৪]

কোন নারীর স্বামী নপুংসক হলে সেক্ষেত্রে তার স্ত্রী বালেগা কিনা সে বিষয়েও একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যদি সে বালেগা হয় তবে স্বামীকে চিকিৎসার জন্য এক বছর সময় দিবে যদি তার

অসুবিধা চিকিৎসাযোগ্য হয়। এরপরও সেই স্বামী সহবাসে অক্ষম হলে আদালত স্ত্রীর দাবি ও সাক্ষ্যের আলোকে বিবাহ বাতিল করে দিবে।[১০৫]

একবার রসূলুল্লাহ্ স. ক্ষতিগ্রস্ত নারী কর্তৃক অপরাধীকে সনাক্ত করার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। বর্ণিত আছে যে, 'এক ইয়াহুদী দুই পাথরের মাঝখানে এক যুবতীর মাথা রেখে থাকে নির্মমভাবে আহত করে তার গলার হার ছিনিয়ে নেয়। তাকে রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে আহত করেছে? সে মাথার ইশারায় বললো না। তিনি বললেন, তবে অমুক ব্যক্তি কি? সে মাথার ইশারায় বললো না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ইয়াহুদী কি তোমাকে আহত করেছে? সে বললো, হ্যাঁ। অতঃপর তাকে গ্রেফতার করে আনা হলে সে তার অপরাধ স্বীকার করে। যুবতী সেই আঘাতে মৃত্যুবরণ করলে রসূলুল্লাহ স. ইয়াহুদীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।[১০৬]

বর্ণিত আছে যে, 'নবী স.-এর জীবদ্দশায় এক মহিলা মসজিদে নববীতে ফজরের নামায পড়তে আসার সময় এক ব্যক্তি তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। মহিলার চিৎকারে লোকজন এসে ধর্ষককে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তাকে নবী স.-এর কাছে নিয়ে আসা হলে মহিলাটি তাকে সনাক্ত করে। নবী স. ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।[১০৭]

উপরোক্ত দু'টি হাদীসের বিবরণ থেকে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে, একজন নারী কর্তৃক অপরাধীকে সনাক্ত করার এবং অপরাধী কর্তৃক অপরাধ স্বীকার করার ভিত্তিতে নবী স. মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় কঠোরতম শাস্তি কার্যকর করেছেন।

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়েও একটি ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে। হদ্দ ও কিসাসের মামলায়ও ক্ষেত্রবিশেষে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। বিচারক যদি এ জাতীয় মামলায় নারীর সাক্ষ্যে আশ্বস্ত হতে পারেন, তবে তার বক্তব্য অবশ্যই মূল্যায়নযোগ্য। এটা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হলেও ইসলামী আইনের নমনীয়তার একটি অনন্য বৈশিষ্ট।

উপসংহার

মানুষ সামাজিক জীব। একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গিয়ে একের সাথে অপরের ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। তাতে কখনো কখনো একের দ্বারা অপরের স্বার্থহানিও ঘটে। ফলে মানুষ ন্যায় বিচার পাওয়ার আশায় আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালতে বাদীও বিবাদীর মধ্যকার ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে 'সাক্ষ্য'-এর ভূমিকা অপরিসীম।

তথ্যপঞ্জি

১. মুহাম্মদ মূসা, 'শাহাদা', ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭), ২৩শ খণ্ড, পৃ. ৬৮২।

২. শায়খ মুহাম্মদ আল-গাযালী, ইসলামী আকীদা, বাঙলা অনু. মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১২/১৯৯২), পৃ. ৬০।

৩. আল কুরআন, ২ : ১৪৩।

৪. ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০৯/১৯৮৯), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৫৬।

৫. প্রাগুক্ত।
৬. মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিকহ (আল-হিন্দ : আশরাফী বুক ডিপো, ১৩৮১/১৯৯১), পৃ. ৩৪২।
৭. গাজী শামসুর রহমান, ইসলামের দণ্ডবিধি (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৮২।
৮. কাওয়াইদুল ফিকহ (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩৭৮।
৯. আল-কুরআন, ২ : ২৮২।
১০. আল কুরআন, ২ : ২৮৩।
১১. আল কুরআন, ৬৫ : ২।
১২. সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদঃ আস-সিতরু আলা আহলিল হুদূদ (আল-কুতুবুস-সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০), হাদীস নং ৪৩৭৭, পৃ. ১৫৪২।
১৩. ফাতওয়া আলমগীরী (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৯-৪৬৮।
১৪. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৬৩।
১৫. আস-সায়্যিদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরুত : দারুল ফাতাহ লিল ই'লামিল আরাবী, ১৪১৭/১৯৯৬), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৯।
১৬. আল কুরআন, ৫ : ১০৬-১০৭।
১৭. ফিকহুস সুন্নাহ (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২০।
১৮. প্রাগুক্ত।
১৯. প্রাগুক্ত।
২০. প্রাগুক্ত।
২১. আল-কাসানী, বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারাই (বৈরুত : দারু ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, ১৪০৩/১৯৮২), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬৮।
২২. প্রাগুক্ত।
২৩. প্রাগুক্ত।
২৪. প্রাগুক্ত।
২৫. আল কুরআন, ৪৯ : ৬।
২৬. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৬৮।
২৭. আল কুরআন, ২৪ : ৪।
২৮. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৬২।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৯।
৩০. প্রাগুক্ত ৫৬৩।
৩১. সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদঃ ফিল মাজনূনি ইয়াসরিকু আও ইউসীবু হাদ্দান (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ৪৪০২, পৃ. ১৫৪৪।
৩২. বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারাই (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭২; আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৭৪-৫।
৩৩. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়ঃ আল-ঈমান, অনুচ্ছেদঃ দুআউকুম ঈমানুকুম (আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০), হাদীস নং ৮, পৃ. ২।
৩৪. আল কুরআন, ২ : ২৮২।
৩৫. আল কুরআন, ৬৫ : ২।
৩৬. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়ঃ আশ-শাহাদাহ, অনুচ্ছেদঃ ইয়াহলিফুল মুদ্দা'আ আলাইহি হাইসুমা ওয়াজাবাত আলাইহিল ইয়ামিনু (প্রাগুক্ত), পৃ. ২১২।
৩৭. সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আল-কাযা, অনুচ্ছেদঃ ইযা আলিমাল হাকিমু সিদকা শাহাদাতিল ওয়াহিদি ইয়াজুযু লাহু আইয়াকযিয়া বিহি (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ৩৬০৭, পৃ. ১৪৯০।
৩৮. আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৬৪।
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।
৪০. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৫৮-৫৫৯; বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারাই (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

৪১. বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারাই (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭৩।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।
৪৩. আল কুরআন, ৪ : ২৮।
৪৪. আল কুরআন ৬৫ : ২।
৪৫. বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া, অধ্যায় : আশ-শাহাদাহ, অনুচ্ছেদঃ মান ইউকবালু শাহাদাতুহু ওয়া মান লা ইউকবালুহু (দিল্লি : দেওবন্দ, কুতুবখানা রহীমিয়্যা, তা.বি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪।
৪৬. ফাতওয়া আলমগীরী (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৫; আল-হিদায়া (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪।
৪৭. প্রাগুক্ত।
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬।
৪৯. ফিকহুস সুন্নাহ (প্রাগুক্ত) ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬।
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫-২৬।
৫১. প্রাগুক্ত।
৫২. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদঃ শাহাদাতুল আ'মা (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ২৬৫৬, পৃ. ২১০।
৫৩. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৬৯; আল-হিদায়া (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫।
৫৪. ফিকহুস সুন্নাহ (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২৩।
৫৫. বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারাই (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬৭; ফাতওয়া আলমগীরী (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৫; আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৬২।
৫৬. আল কুরআন, ৪ : ১৪১।
৫৭. আল কুরআন, ৫ : ১০৬।
৫৮. আল কুরআন, ৮ : ৭৩।
৫৯. আল কুরআন, ৩ : ৭৫।
৬০. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৮৬।
৬১. ফাতওয়া আলমগীরী (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৮; আল-হিদায়া (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭।
৬২. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়; ফাযাইলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদঃ তাহরীমু সাব্বিস-সাহাবা আল-কুতুবুস-সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০), হাদীস নং ৬৪৮৮, পৃ. ১১২৩।
৬৩. বাদাইউস সানাইএর বরাতে ফাতওয়া আলমগীরী (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৭।
৬৪. আল কুরআন, ১৮ : ২৮।
৬৫. সুনানে ইবনে মাজা, অধ্যায়ঃ আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদঃ শাহাদাতুয-যুর (আল-কুতুবুস-সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০), হাদীস নং ২৩৭৩, পৃ. ২৬১৯।
৬৬. সুনান ইবনে মাজা, শাহাদাত, বাবা মিথ্যা সাক্ষ্যদান, নং ২৩৭৩।
৬৭. অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০০), পৃ. ৫৭৪।
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫।
৬৯. সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাযা, অনুচ্ছেদঃ শাহাদাতুল বাদঈ আলা আহলিল-আনসার (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ৩৬০২, পৃ. ১৪৯০।
৭০. সুনানে আবূ দাউদ, অধ্যায়ঃ আস-সিয়াম, অনুচ্ছেদঃ ফী শাহাদাতিল ওয়াহিদ আলা রুইয়াতি হিলালি রমযানা (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ২৩৪০, পৃ. ১৩৯৭।
৭১. আল-হিদায়া, অধ্যায়ঃ আশ-শাহাদাহ, অনুচ্ছেদঃ মান ইউকবালু শাহাদাতুহু ওয়া মান লা ইউকবালু (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫।
৭২. বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারাই (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬৯।
৭৩. আল-হিদায়া (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮।
৭৪. প্রাগুক্ত।
৭৫. ফাতওয়া আলমগীরী (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।
৭৬. আল-হিদায়া (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮।
৭৭. আল-হিদায়া, অধ্যায়ঃ আর রুজু আনিশ শাহাদাত (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭-১৬১।

৭৮. আল-কাসানী, বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারাই, অধ্যায়: আর রুজু আনিশ শাহাদাহ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮২।
৭৯. সম্পাদনা পরিষদ, ফাতওয়া আলমগীরী, অধ্যায়: আর রুজু আনিশ শাহাদাহ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০৩-৬১২।
৮০. সম্পাদনা পরিষদ, ফাতওয়া আলমগীরী, অধ্যায়: আর রুজু আনিশ শাহাদাহ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০৩-৬১২।
৮১. প্রাগুক্ত।
৮২. আল-কাসানী, বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারাই, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৭৭-৭৮।
৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭২।
৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮০-৮২।
৮৫. ফাতওয়া আলমগীরী, অধ্যায়: রুজু আনিশ শাহাদাহ (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮২-২৮৩।
৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-২৮৫।
৮৭. আল কুরআন, ৪ : ১৫।
৮৮. আল কুরআন, ২৪ : ৪।
৮৯. আল কুরআন, ২৪ : ৪।
৯০. আবদুল আযীয আল-খাওলী, মিফতাহুস সুন্নাহ (প্রাগুক্ত), পৃ. ৪২৬।
৯১. আল কুরআন, ৬৫ : ২। হদ্দ-এর ব.ব. হুদূদ (সীমা) ইসলামী আইনে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধ ও সেগুলোর সুনির্ধারিত শাস্তিকে হদ্দ বলা হয়। যেমন চুরির শাস্তি হস্তকর্তন, মাদক গ্রহণে শাস্তি বেত্রাঘাত ইত্যাদি।
৯২. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: ফিররাহন ফিল-হাযার, অনুচ্ছেদ: ইযা ইখতিলাফার রাহিনু ওয়াল মুরাহিনু ওয়া নাহহু... (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ২৫১৫, ২৫১৬, পৃ. ১৯৮।
৯৩. আল কুরআন, ২ : ২৮২।
৯৪. আবদুল আযীয আল-খাওলী, মিফতাহুস সুন্নাহ (প্রাগুক্ত), পৃ. ৪২৭।
৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮।
৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯।
৯৭. সুনানে আবূ দাউদ, অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : ইযা 'আলিমাল হাকিম (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ৩৬০৭, পৃ. ১৪৯০-৯১।
৯৮. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ: শাহাদাতুল মুরযিয়াহ (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ৫১০৪, পৃ. ৪৪১।
৯৯. আল-হিদায়া, অধ্যায়: আশ-শাহাদাত (প্রাগুক্ত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৮।
১০০. আল-কুরআন, ২ : ২৮২।
১০১. ফাতওয়া আলমগীরী অধ্যায়: আশ-শাহাদাত (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৫।
১০২. আল-হিদায়া, অধ্যায়: আশ-শাহাদাত (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮-১৩৯।
১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।
১০৪. প্রাগুক্ত।
১০৫. ফাতওয়া আলমগীরী (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৫; আল-হিদায়া (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯।
১০৬. সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়: আদ-দিয়্যাত, অনুচ্ছেদ: ইউকতাদু মিনাল কাতিলি কামা কাতালা প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৬৬৫-৬৬, পৃ. ২৬৩৭।
১০৭. সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়: আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ: আল-মুস্তাকরাহ (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ২৫৯৮, পৃ. ২৬৩২।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১২, পৃষ্ঠা : ২৬-৫৫

হাদীসের ইতিহাস

ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ

কুরআন ও হাদীস

পবিত্র হাদীস অনিবার্য ভাবেই পবিত্র কুরআনকে অনুসরণ করে। এ দুটি একত্রে মিলে ইসলামের মৌলিক আইনের ভিত্তি রচনা করে। সুতরাং হাদীসের গুরুত্ব বর্ণনার পাশাপাশি কুরআন শরীফের সঙ্গে এর সম্পর্কের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। কুরআন শরীফের বহু জায়গায় মুসলমানগণকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্দেশ মান্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন কুরআন শরীফে এসেছে- 'তিনি তোমাদের যে কাজ থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক (৫৯:৭)।' অন্যত্র এ বিষয়টি আরো জোরালো ভাবে এসেছে- 'যে মুহাম্মদ স.-এর আনুগত্য করল, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল (৪:৮০)।'

উপরে বর্ণিত আয়াত ছাড়াও একই ধরনের আরো বিভিন্ন আয়াত দ্বারা হাদীস সম্পর্কে কুরআন শরীফের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে আমরা ধারণা লাভ করতে পারি এভাবে যে, হাদীস শরীফ কোন ক্রমেই গুরুত্বহীন কোন বিষয় নয়। বরং এটিকে কুরআন শরীফেরই একটি অংশ হিসাবেই প্রায় গণ্য করতে হবে। মনে করুন এক দেশের প্রধান নির্বাহী ব্যক্তির বার্তা নিয়ে তার দূত অন্য সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছে দিতে যাচ্ছেন। এটি নিশ্চিত, যে চিঠিটি তার কাছে দেয়া হচ্ছে সেটিতে যথেষ্ট বিস্তারিত ভাবে সব কিছু লিপিবদ্ধ থাকবে না। এ পরিস্থিতিতে চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে যে আলোচনা হবে (চিঠি গ্রহীতা ও দূতের মাঝে) সেখানে দূত যে কথাগুলো বলবেন তার প্রতিটি শব্দকে তার প্রেরক অর্থাৎ সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের বক্তব্য বলেই গণ্য করা হবে। এ দৃষ্টান্ত দেবার উদ্দেশ্য হল এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা যে, প্রকৃত পক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস একই বস্তু। দুটিই মূলত এক ও অভিন্ন মর্যাদা (Status) বহন করে। এ তত্ত্বটিকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যার জন্য আরো একটি উদাহরণ সাহায্য করবে। মনে করুন রসূলুল্লাহ স. জীবিত। আমাদের একজন তাঁর কাছে গেলেন দেখা করার জন্য এবং তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। অতপর তিনি তাঁকে রসূলুল্লাহ বলে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, 'কুরআন শরীফ আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী। আমি একে গ্রহণ করছি। তবে হাদীস হলো আপনার নিজের কথা। কাজেই আপনার কথা গ্রহণ করতে বা এর উপর আমল করতে আমি বাধ্য নই।' এ ধরনের উক্তির পরিণতি হবে নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহ থেকে ঐ ব্যক্তির বহিষ্কার। বস্তুত রসূলুল্লাহ স.-এর উপস্থিতিতে তাঁর নির্দেশকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত হিসাবে আখ্যায়িত করা

লেখক : জন্ম ভারতের হায়দারাবাদ। উচ্চশিক্ষার্থে প্রবাসে থাকাকালে মুসলিম হায়দারাবাদ ভারতের শাসনাধীন হয়। অতঃপর তিনি প্যারিসে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত জীবন যাপন করেন বিশ্ববরেণ্য মুসলিম মনীষী ও গবেষক এবং কয়েকটি কালজয়ী গ্রন্থের লেখক।

এবং সেটি কোন মুসলমানের মান্য করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই -এরূপ বলা প্রকৃত পক্ষে ইসলামকে অস্বীকার করারই শামিল।

রসূলুল্লাহ স.-এর কোন নির্দেশের অবস্থান বা মর্যাদা তেমনি যেমন স্বয়ং আল্লাহ তাআলার নির্দেশের অবস্থান। এই দুটিতে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে মূলত এ জন্য যে, কুরআন শরীফের সংগ্রহ, যথার্থতা বিচার-পর্যালোচনা (Collation) এবং সংরক্ষণের প্রক্রিয়া হাদীস শরীফের সংগ্রহ, যথার্থতা বিচার-পর্যালোচনা এবং সংরক্ষণের প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন। এভাবে দুটিতে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটি মূলত এগুলোর যথার্থতা বিচার-পর্যালোচনা (Authentication) এবং অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে। রসূলুল্লাহর স. জীবদ্দশায় তাঁর নির্দেশনার যথার্থতা প্রমাণের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। যা কিছু তিনি বলেছেন তা তাঁর নির্দেশ হিসেবে সন্দেহাতীত গণ্য করা হয়েছে। প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে তাঁর ইন্তিকালের পর।

মনে করুন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে কোন কিছু শুনেছি। তারপর সেটি আমি আপনার কাছে বলেছি। রসূলুল্লাহ স. নিঃসন্দেহে তাঁর বক্তব্যে ঠিক আছেন। কিন্তু মানুষ হিসাবে আমার মানবীয় দুর্বলতা থাকতে পারে। আমার স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা থাকতে পারে বা আমি ভুলে যেতে পারি। আমি রসূলুল্লাহর স. বক্তব্য যেভাবে বুঝেছি, সেখানে ভুল হতে পারে। হতে পারে আমি তাঁর বক্তব্য ঠিকমত শুনিনি। সেটা হতে পারে প্রয়োজনীয় মনোযোগ না থাকার কারণে অথবা আশেপাশের শব্দের কারণে। মোট কথা, রসূলুল্লাহর স. বক্তব্য যথাযথ ভাবে বর্ণনা করতে না পারার বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। এ কারণেই রসূল স.-এর তিরোধানের পর হাদীস শরীফ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সেরূপ চূড়ান্ত সংশয়মুক্ত অবস্থা (Status) ছিল না, যেটি কুরআন শরীফ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে বর্ণনার ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ন ছিল। কারণ, কুরআন শরীফ সংকলনের কাজ রসূলুল্লাহ স. নিজে সম্পন্ন করিয়ে রেখেছিলেন। কুরআন শরীফ সংরক্ষণের জন্য তিনি এমন সব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যা অন্য কোন নবী রসূল গ্রহণ করেননি। অন্তত ইতিহাস এমন একটি উদাহরণও দিতে পারেনি। কিন্তু হাদীসের ক্ষেত্রে বিষয়টি এরূপ ছিল না। কুরআন শরীফের প্রতি আল্লাহর রসূল স. যেরূপ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এক্ষেত্রে হাদীসের বিষয়ে ঠিক ততখানি গুরুত্ব বা মনযোগ তিনি দেননি। এ ধরনের আপাত গুরুত্বহীনতার অন্যতম সম্ভাব্য কারণ ছিল তাঁর সহজাত বিনয়ের মনোভাব। তিনি নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করতেন, যিনি শুধুমাত্র নবী হওয়ার কারণে সকলের চেয়ে শ্রেয় হয়ে উঠেননি।

রসূলুল্লাহ স. এর বাণী ও অহী

রসূল স. যা কিছু বলেছেন সবই অহী-নির্ভর। যখনই তিনি কোন অহী লাভ করেছেন, তিনি সেটি সকলের কাছে সম্পূর্ণভাবে পৌঁছে দিতে ভুল করেননি। যখন তাঁর কাছে অহী'র আগমন বন্ধ থাকত, তখন তিনি অহী'র জন্য অপেক্ষা করতেন। কারণ বিষয়টির উপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর ইচ্ছা অহী পাঠিয়েছেন, যখন ইচ্ছা বন্ধ রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রসূলের স. অহীর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন করণীয় ছিল না। কেননা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনাকে অহী'র দ্বারা সমর্থিত বা অহী দ্বারা প্রাপ্ত বিষয় বলে আখ্যায়িত করতে পারেন না।

আমরা হাদীস শরীফে এমন অনেক উদাহরণ দেখতে পাই যার মধ্য দিয়ে এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রসূলুল্লাহ স. সাধারণত পার্থিব বিষয়ে অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। যেমন এক হাদীসে এসেছে, একবার রসূলুল্লাহ স. কোন এক বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামকে কিছু নির্দেশ দিলেন। তখন এ নির্দেশ তিনি অহী'র মাধ্যমে পেয়েছেন কি না সাহাবায়ে কিরাম তা জানতে চাইলেন। জবাবে আল্লাহর রসূল স. বললেন, 'এগুলো যদি অহী'র মাধ্যমে পেতাম, তবে তোমাদের সাথে এ নিয়ে পরামর্শ করতাম না।'

খেজুর-বৃক্ষ নিয়ে অন্যত্র একটি চমৎকার হাদীস এসেছে। রসূলুল্লাহ স. যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তিনি লক্ষ করলেন, পুরুষ খেজুর গাছের পরাগ-রেণু মাদী গাছের পরাগের সাথে কৃত্রিম ভাবে মিশিয়ে পরাগনিষিক্ত করা হচ্ছে, যেন মাদী গাছটি ফলবাণ হয়। সম্ভবত নিজের সহজাত পরিমিতিবোধের কারণে তাঁর স. কাছে বিষয়টি ভাল লাগেনি। তিনি বললেন, পুরুষ-মাদী গাছের ভেতর কৃত্রিম ভাবে এ রকম পরাগায়ণ ঠিক নয়। তিনি লোকজনকে এ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার পর খেজুরের ফলন সে বার কমে যায়। কয়েকজন সাহাবী রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললেন, 'পরাগায়ণ না করার কারণে খেজুরের ফলন এবার অনেকখানি কম হয়েছে।' তিরমিজি শরীফের এক হাদীস অনুযায়ী তখন আল্লাহর রসূল স. তাঁদেরকে বললেন, 'তোমাদের পার্থিব বিষয়ে আমার চেয়ে তোমরাই ভাল জান।'

উপরের এই দৃষ্টান্ত থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রসূলুল্লাহ স. যে কোন বক্তব্য, যদি সেটি অহী দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে তার মর্যাদা কুরআনের মর্যাদার অনুরূপ। কিন্তু যেখানে তিনি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেখানে সে অভিমতের মর্যাদা একজন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিজস্ব উক্তির অনুরূপ। সেটি কোনভাবেই আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত অহী'র সমান নয়।* হাদীস শরীফে এমন পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ স. বিভিন্ন সময় (চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে) চার রাকাআতের পরিবর্তে তিন রাকাআত নামায পড়েই নামায শেষ করে ফেলেছেন, অথবা যেখানে দু'রাকাআত হবার কথা, সেখানে তিনি তিন রাকাআত পড়েছেন। এ ধরনের ভুল হওয়া নিতান্তই মানবীয় একটি ব্যাপার। হতে পারে এমনটি ঘটেছে আল্লাহর পক্ষ থেকেই এমন ধরনের ফয়সালার কারণে। এর ব্যাখ্যা এ রকম ঃ আল্লাহ্ রববুল আলামীন রসূলুল্লাহ স.-কে 'মানবজাতির জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত বা নমুনা' বলে প্রশংসিত করেছেন। যেমনটি কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহর রসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম দৃষ্টান্ত (৩৩:২১)।' একজন বার্তাবাহক (রসূল) উত্তম দৃষ্টান্ত বা নমুনা এবং যথার্থ মডেল তখনই হতে পারেন, যখন তিনি মানবীয় সীমার মধ্যে থাকেন, অর্থাৎ তিনি এমন কাজই করেন যা অন্য সকল মানুষ করতে পারবে। তা না হয়ে যদি তিনি হন সুপারম্যান বা অতি মানব, তবে তিনি আমাদের জন্য উত্তম নমুনা হতে পারবেন না। এ জন্যই আমরা এমন সব উদাহরণ দেখতে পাই - যদিও সেটি নিতান্তই কদাচিৎ ঘটেছে- যেখানে দেখা যাচ্ছে রসূলুল্লাহ স. কোনদিন হয়তো ফজরের সময় নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে সময় মত জেগে উঠতে পারেননি অথবা নামায পড়তে গিয়ে রাকআতের সংখ্যায় ভুল করেছেন ইত্যাদি। এসব ঘটনায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার প্রজ্ঞাপূর্ণ বিবেচনায় এটাই চেয়েছেন

---

* লেখক সম্ভবত এখানে বুঝাতে চেয়েছেন, কোন পার্থিব বিষয়ে যদি রসূলুল্লাহ স. ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করেন, যা প্রকাশ্য অহী দ্বারা সমর্থিত নয়– যেমন পরাগায়নের বিষয়ে তাঁর অভিমত- তবে সেটি অহী'র সমান নয়।

যে, মানুষ যেন বুঝে মুহাম্মদ স. মানুষ; অন্য কিছু নন বা অতি মানব নন। আমরা যেন এমন মনে না করি যে, আমরা রসূলুল্লাহর স. দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারবো না বা যে কাজ তিনি একজন মানুষ হিসাবে করেছেন তা আমরা সম্পাদন করতে পারবো না। আমাদের মনে রাখা উচিত, রসূল স. এ বিষয়টি সর্বদা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন যে, তিনি এমন কিছু করবেন না বা করছেন না, যা তাঁর উম্মতের করার মত ক্ষমতা নেই; তাদের ক্ষমতার বাইরে। যেমন 'বিসাল' নামক রোযার দৃষ্টান্তের কথা মনে করুন। এ রোযার সময়কাল যেদিন রোযা রাখা হয় সেদিন সন্ধ্যার পরিবর্তে আরো দু দিন অথবা আরো বেশি সময় পরে গিয়ে শেষ হয়। রসূলুল্লাহ্ স. তাঁর সাহাবীগণকে এ রোযা না রাখার জন্য জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি তাঁদেরকে দীর্ঘ ২৪ ঘন্টা সময়ব্যাপী রোযা রাখতেও বারণ করেছেন। এছাড়া তিনি রোযা রাখার সময় ফজরের আগে সাহরী খেয়ে নিতে বলেছেন। তিনি এর উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। একবার এক সাহাবী রসূলুল্লাহ্ স.-কে এ বিষয়ে বললেন, আল্লাহর রসূল এ ক্ষেত্রে (রোযা রাখা) নিজে এক রকম করেন আর অন্যদেরকে আরেক রকম করতে বলেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত সাহাবী নিজেও রসূলুল্লাহ্ স.-এর মত করে রোযা রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আল্লাহর রসূল স. তাঁকে চেষ্টা করে দেখার অনুমতি দিলেন। (সময়টি ছিল রমযান মাসের শেষ দিকের।) তখন রসূলুল্লাহ্ স. নিজে রোযা রাখলেন চব্বিশ ঘন্টা সময়ব্যাপী। পরে তা আরো বাড়িয়ে তিনি ৪৮ ঘন্টা ব্যাপী একটানা রোযা রাখলেন। সাহাবায়ে কিরাম চিন্তায় পড়ে গেলেন। ঘটনাক্রমে ২৯ রোযার দিন শেষে চাঁদ দেখা যায় এবং রসূলুল্লাহকে স. রোযা ভাঙ্গতে হয়। যদি ঐ রাতে শাওয়ালের চাঁদ না দেখা যেত, তাহলে হয়ত রসূলুল্লাহ্ স. তাঁর রোযা আরো দীর্ঘায়িত করে ৭২ ঘন্টাব্যাপী রাখতেন! সাহাবায়ে কিরাম তখন এ ঘটনার দ্বারা বুঝতে পারলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ স.-এর অনুসরণ করে তাঁর মত হবার চেষ্টা একেবারেই ঠিক নয়। অল্প কিছু মানুষ হয়ত তাঁকে এ ক্ষেত্রে অনুকরণ করতে পারবেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়।

হাদীসের গুরুত্ব

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল হাদীসের গুরুত্ব কুরআন শরীফের গুরুত্বের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এখানে পার্থক্য শুধু এটুকুই, কুরআন শরীফের যথার্থতা সম্পর্কে আমাদের কাছে যেরূপ নিখুঁত প্রমাণ রয়েছে, হাদীসের সঠিকত্বের ব্যাপারে আমাদের কাছে ঠিক ততখানি নিখুঁত প্রমাণ নেই। কুরআন শরীফ চৌদ্দ শ' বছর আগে রসূলুল্লাহ্ স.-এর জীবদ্দশায় ঠিক যেভাবে ছিল, ঠিক তেমনি অবিকৃত অবস্থায় আজও সংরক্ষিত আছে। কুরআন শরীফের কোন একটি শব্দ, অক্ষর এমনকি একটি নুক্তাও পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু হাদীস শরীফের ব্যাপারে ঠিক এভাবে বলা সম্ভব নয়।

অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও কুরআন শরীফের অনুরূপ ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। যেমন, ইহুদীদের কাছে রয়েছে তাওরাত। অন্যান্য জাতিও তাদের প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রাপ্ত ধর্মগ্রন্থ রয়েছে বলে দাবী করে থাকে। তবে আমরা কুরআন শরীফের বিপরীতে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অস্তিত্ব যেভাবে খুঁজে পাই, হাদীস শরীফের বিপরীতে সে রকম কোন দৃষ্টান্ত আমরা খুঁজে পাই না। বৌদ্ধ ধর্মে কিছুটা এ ধরনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিন্তু সেটি ততখানি গুরুত্ব লাভ করে না, যতখানি আমরা হাদীস শরীফকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। বৌদ্ধ

ধর্মে মূল ধর্মগ্রন্থ বলে যা রয়েছে সেটি অনেকটা কোন ধর্মীয় সাধু ব্যক্তির ধর্মালোচনার সমষ্টির মত যা তাঁর অনুসারীবৃন্দ সংগ্রহ করে রেখেছেন। বস্তুত, গৌতম বুদ্ধের বাণীসমূহ সংকলিত হয়েছে একজনের হাত দিয়ে। কিন্তু হাদীস শরীফ সংকলিত ও বিধৃত হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা। হাদীসের এ বৈশিষ্ট্যটি সহজেই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে অন্য ধর্মে এই ব্যাপারটির অনুপস্থিতির কারণে।

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, হাদীস শরীফ জ্ঞানের এমন একটি শাখা, অন্যান্য ধর্মে যার সমপর্যায়ের কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। কাজেই এ ক্ষেত্রে তুলনামূলক পর্যালোচনা করারও কোন সুযোগ নেই। অতএব, এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স.-এর বিবৃত হাদীসের ইতিহাস নিয়েই আমাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

হাদীস ও সুন্নাহ

কিছু প্রত্যয়গত শব্দ (টেকনিক্যাল টার্ম) নিয়ে আলোচনা করা যাক। এ ক্ষেত্রে হাদীস ও সুন্নাহ এ রকম দুটি শব্দ পাওয়া যায়। এ দুটি শব্দ প্রায় সমার্থক। এ দুটি একই অর্থ বহন করে এবং একই বার্তা পৌছে দেয় অর্থাৎ এগুলোর দ্বারা রসূলুল্লাহ স.-এর বাণীকে বুঝানো হয়। তাঁর কাজের বিবরণও এই শ্রেণীতে পড়ে- অর্থাৎ কেউ একজন বললেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে কোন কাজ করতে দেখেছেন বা কোন কিছু বলতে শুনেছেন। এগুলো হাদীস। এছাড়া সেটিও হাদীস যেটিকে মুহাদ্দিসগণ 'তাকরীর' বলে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ রসূলুল্লাহর স. নীরব সমর্থন- এটিও হাদীস। অর্থাৎ এগুলো এমন কাজ যা দেখে তিনি নীরব থেকে অনুমোদন দিয়েছেন। যেমন কোন সাহাবী কোন একটি কাজ করলেন। রসূলুল্লাহ স. তা দেখে তাঁকে বাধা দিলেন না বা নীরব রইলেন। তাঁর নীরবতা তাঁর অনুমোদনের সমার্থক। এর অর্থ হলো, তাঁর নীরব থাকাও ইসলামী আইনের একটি উৎস। রসূলুল্লাহ স.-এর দায়িত্ব হলো মন্দ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করা। তিনি কোন ব্যক্তির কোন ভুল কাজ একবার দেখে ক্ষমা করে দিতে পারেন, যেটি অজ্ঞানতার কারণে অথবা গুরুত্ব ঠিক মত না দেবার কারণে ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু তিনি যদি দেখেন ঐ একই ভুল কাজটি ঐ ব্যক্তি আবারও করতে যাচ্ছেন তবে অবশ্যই তিনি তাকে নিষেধ করবেন যেন ঐ কাজটি তিনি পুনরায় না করেন। মোট কথা, হাদীসের তিনটি উপাদান রয়েছে- রসূলুল্লাহ স.-এর কথা, তাঁর কাজ এবং অন্যের কোন কথা বা কাজের প্রতি তাঁর নীরব সমর্থন। শেষোক্ত ধরনটিকে, যার কথা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, বলা হয় 'তাকরির'।

প্রথম দুটি প্রত্যয় অর্থাৎ হাদীস ও সুন্নাহ প্রথম দিকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতো। তবে এখন এ দুটো সমার্থক শব্দ। হাদীস বলতে বুঝায় বক্তব্য বা কথা, অন্য দিকে সুন্নাহ হলো কোন কিছু করার পন্থা বা উপায়। বর্তমানে এ দুটো (কথা ও কাজ) একই অর্থবোধক শব্দে পরিণত হয়েছে। কারণ সাহাবায়ে কিরাম যখন {রসূলুল্লাহ স.-এর} কোন কিছু উল্লেখ করেছেন সেটি রসূলুল্লাহ স. -এর কথা ও কাজ এ দুটোকেই বুঝিয়েছে। বস্তুত রসূলুল্লাহ স.-এর উক্তি ও কাজকে তখন আলাদাভাবে দেখা কঠিন ছিল। কাজেই বর্তমানে 'হাদীস' ও 'সুন্নাহ'-এ দুটো শব্দই ব্যবহারিক অর্থে রসূলুল্লাহ স.-এর কথা ও কাজকেই বুঝায়। এখন এ দুটো শব্দের ভেতর কোন পার্থক্য আর অবশিষ্ট নেই।

কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের মাঝামাঝি আরেকটি তৃতীয় ধরন রয়েছে সেটি হল হাদীসে কুদসী। সাধারণ হাদীস ও হাদীসে কুদসীর ভেতর প্রকৃত পার্থক্য খুব সামান্যই। তবে একটি পর্যায় পর্যন্ত এ

দুটোকে আলাদাভাবে দেখতে হবে। হাদীসে কুদসীও আসলে রসূলুল্লাহ স.-এর এক ধরনের উক্তি যা তিনি উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু এ ধরনের হাদীস সব সময় শুরু হয়েছে 'আল্লাহ বলেন' -এ দুটো শব্দ দিয়ে। এর দ্বারা বুঝা যায় পুরো হাদীসটি প্রকৃত পক্ষে অহী-ভিত্তিক একটি হাদীস। বস্তুত আমরা এ বিষয়ে একমত হতে পারি যে, রসূলুল্লাহ স.-এর সকল হাদীসই অহী-ভিত্তিক। যেমন কুরআন শরীফে এসেছে- 'তিনি নিজের মন থেকে বানিয়ে কোন কিছু বলেন না; যা কিছু বলেন সকলই অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত।' (৫৩:৩-৪)। কিন্তু যেখানে রসূলুল্লাহ স. নিজেই কথা শুরু করেন 'আল্লাহ বলেন'-এ দুটো শব্দ দ্বারা, সেটির মর্যাদা যে অনেক উচ্চে -এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ একমত এবং একে তাঁরা বলেন 'হাদীসে কুদসী।' এ ধরনের উক্তি প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে হুবহু সেই একই ধারায় বর্ণিত হয়ে এসেছে, যেভাবে যে ধারায় অন্যান্য সাধারণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে; যেখানে রসূলুল্লাহ স. হাদীসে কুদসী'র ঐ শব্দ দুটো ('আল্লাহ বলেন') ব্যবহার করেননি। এ বিষয়ে প্রকাশিত/অপ্রকাশিত প্রচুর বইপত্র রয়েছে।
প্রধানত হাদীসকে দু'প্রকারে চিহ্নিত করা যায় : এক. আনুষ্ঠানিক দাপ্তরিক চিঠিপত্র বা দলিল দুই. রসূলুল্লাহর স. কথা ও কর্মের বিবরণ। সাহাবায়ে কিরাম ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেগুলো সংগ্রহ করেছেন। প্রথম প্রকারটি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

দাপ্তরিক দলিলপত্র: প্রারম্ভিক হাদীস

কিছু কিছু দলিল (Documents) রয়েছে যেগুলো বেশ আগের, এমন কি মদীনায় রসূলুল্লাহ স. হিজরতেরও পূর্বের। আমরা নিশ্চয়ই এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত আছি যে, নবুওয়তের পঞ্চম বছর, যখন মক্কার পৌত্তলিক অধিবাসীরা মুসলমানদের উপর নির্যাতনের মাত্রা তীব্র করে তুলেছিল, তখন রসূলুল্লাহ স. কিছু সংখ্যক মুসলমানকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত একটি দলিলের কথা আমরা জানি, নবী-জীবনী বা সীরাত গ্রন্থে যার উদ্ধৃতি প্রায়শই পাওয়া যায়। এটি ছিল আবিসিনিয়ার তৎকালীন শাসকের প্রতি প্রেরিত একটি চিঠি, যা আল্লাহর রসূল স. তাঁর চাচাতো ভাই হযরত জা'ফর আত্-তাইয়ারকে দিয়েছিলেন, যেন তিনি এটি বাদশাহকে হস্তান্তর করেন। চিঠিটির শেষের দিকে এ কথাগুলো লেখা ছিল–
'আমি আমার চাচাতো ভাই জা'ফরকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন মুসলমান রয়েছেন। যখন তাঁরা আপনার কাছে উপস্থিত হবেন, তখন অনুগ্রহ করে তাঁদের প্রতি আপনার আতিথেয়তার হাত প্রসারিত করবেন।'
এ চিঠিটিতে কোন তারিখ যদিও ছিল না, তবে এটি ঠিক যে, এটি আবিসিনিয়ার হিজরতের সময়কালীন। এ দলিলটির পাশাপাশি আরো একটি আগ্রহোদ্দীপক দলিলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যেটি অনেককে বিস্মিত করে তোলে। এটি হল হযরত তামীম আদ দারী রা.-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি ছিলেন সিরিয়ার একজন খ্রিস্টান। তিনি সেখান থেকে মক্কায় আগমন করেন এবং ইসলাম কবুল করেন। তিনি ছিলেন বহু সমুদ্র-ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ একজন নাবিক। সহীহ মুসলিম শরীফে তাঁর এ সব ভ্রমণের কিছু কিছুর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ স., আমি নিশ্চিত, মুসলিম বাহিনী অচিরেই সিরিয়া জয় করবে। যখন এ ঘটনা ঘটবে, -সিরিয়াবাসী

বলতে লাগলেন, তখন যেন আমাকে পুরস্কৃত করা হয় এবং সামরিক বাঁশির (তূর্য) প্রতীক স্বরূপ কোন জনপদ আমাকে দেয়া হয়।' ঐতিহাসিকদের মতে, রসূলুল্লাহ স. তখন এ মর্মে একটি লিখিত নির্দেশনা দেন যে, 'যদি মারতাম, হেবরন এবং .... (কতগুলো জনপদের কথা বলেন) বিজিত হয়, তবে এগুলো যেন তামীম আদ দারী'র দায়িত্বে অর্পণ করা হয়।' বর্ণিত এ দলিলটিও হিজরত-পূর্ব কালীন সময়ের। এ সময়ের আরো কিছু এ ধরনের লিখিত দলিলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হল মদীনায় হিজরতকালীন সময়, যেখানে মককা থেকে মদীনায় যেতে প্রায় ১২ দিন সময় লেগেছিল। আমরা এ সময়কালীন লিখিত দলিল সম্পর্কেও জানতে পেরেছি। যেমন এ সময় সুরাকা ইবনে মালিকের পশ্চাদ্ধাবনের ঘটনাটির কথা বলা যায়। সে সময় মককার কুরাইশরা রসূলুল্লাহ স.-এর মাথার মূল্য ঘোষণা করেছিল। ঐ ঘোষণার প্রেক্ষিতে সুরাকা রসূলুল্লাহ স.-এর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন তাঁকে আটক করে কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দেয়ার জন্য। তখন অনেকগুলো অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল এবং এক পর্যায়ে সুরাকা আল্লাহর রসূলের স. কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন। রসূলুল্লাহ স. তাকে ক্ষমা করে দেন। তখন সুরাকা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে লিখিত নিরাপত্তা দেবার জন্য অনুরোধ করেন। রিওয়ায়েতকারীগণ বলেন, ঐ ভ্রমণের সময় রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে কলম, কালি ও কাগজ ছিল এবং আমির ইবনে ফাহিরা নামে একজন ক্রীতদাস তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। রসূলুল্লাহ স. তাকে নিরাপত্তার দলিল তৈরী করতে বলেন। এ দলিল রসূলুল্লাহ স. পক্ষ থেকে সুরাকাকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে। পরবর্তীতে সুরাকা মুসলমান হন। যখন তিনি মুসলমান হওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে আসেন, তখন তিনি ঐ চিঠিটি প্রদর্শন করেন। সাহাবায়ে কিরাম তাকে ঐ চিঠির কারণে রসূলুল্লাহ স.-এর সমীপে অগ্রসর হবার সুযোগ দেন। বরং তাঁরাই সুরাকাকে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এগিয়ে দেন। ফলে সুরাকা রা. রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে কথা বলার সুযোগ লাভ করেন।

এটি হিজরতকালীন সময়ের অন্যতম লিখিত দলিল। তবে এ সময়ের দলিলের সংখ্যা অল্প। বস্তুত আলোচিত এ দলিলটি হিজরতকালীন সময়ের ভ্রমণের সাথে সম্পর্কিত একমাত্র দলিল।

মদীনায় রসূলুল্লাহ স.-এর আগমনের সাথে সাথে এ ধরনের দলিলের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে। এগুলোর মধ্যে দাপ্তরিক (official) এবং ব্যক্তিগত উভয় প্রকার দলিল অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে কিছু আছে এমন ধরনের দলিল, যেগুলো ঐ যুগে বা ঐ সময়ে থাকতে পারে এটি ধারণাও করা যায় না। যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম স. একবার মুসলিম জনসংখ্যা শুমারীর নির্দেশ দেন। বুখারী শরীফের ভাষ্য মতে, জনসংখ্যা শুমারী করে ১৫০০ মুসলিম জনসংখ্যার একটি তালিকা তৈরী করা হয়, সেখানে নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়। বুখারী শরীফে এ জনসংখ্যা শুমারীটি কোন্ বছর অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে মুসলিম জনসংখ্যার স্বল্পতা দেখে অনুমাণ করা যায় এটি খুব সম্ভব মদীনায় মুসলমানদের হিজরতের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আনুমানিক দু'শ পরিবার মক্কা থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যেখানে প্রায় পাঁচশ লোক ছিলেন। জনসংখ্যার ঐ তালিকায় মদীনার মুসলমানগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব ১৫০০ জনসংখ্যার ঐ তালিকা দ্বারা এটিই বুঝা যায় যে, এ শুমারীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামের প্রাথমিক

দিকে। কেননা পরের দিকে মুসলিমদের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেমন বিদায় হজ্জের সময় ১ লক্ষ ২০ হাজার মুসলমান হজ্জ সম্পন্ন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ১৫০০ আর ১ লক্ষ ২০ হাজারের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে !

মদীনার শাসনতন্ত্র

বর্ণিত জনসংখ্যা শুমারী ছাড়াও আমরা আরেকটি ঘটনার কথা জানতে পারি, যেটি খুব সম্ভব হিজরতের প্রথম বছর ঘটেছিল। সেটিও ছিল অপ্রত্যাশিত ধরনের একটি ঘটনা, বিস্ময়কর ঘটনা। সেটি হল রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। কেন একটি রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল?

কুরাইশদের নির্যাতনের কারণে মক্কার মুসলমানগণ একে একে মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন এবং রসূলুল্লাহ স.-এর সঙ্গে যোগ দেন। মক্কার কুরাইশরা যদি তাদের শত্রুতা এ সময় অব্যাহত না রেখে বরং এ থেকে নিবৃত্ত হত, তাহলে হয়তো মুসলমানগণ দ্রুত ভুলে যেতেন তাঁদের জীবন ও সম্পদহানির কষ্ট। ভুলে যেতেন তাঁদের দেশ ছেড়ে নির্বাসিত জীবনযাপনের কথা। তাঁরা হয়ত মদীনায় নতুন জীবন শুরু করতেন। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা তাঁদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। তারা যখন দেখল, তাদের শত্রু মুহাম্মদ স. তাদের হাত ফসকে বেরিয়ে গেছেন, তখন তারা হয়ে ওঠে বন্য এবং প্রতিহিংসাকাতর। তারা মদীনাবাসীকে হুশিয়ারী দিয়ে লিখে পাঠায় যে, তাদের শত্রু, যে তাদের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁকে হয়তো সেখান থেকে বহিষ্কার করতে হবে, অথবা হত্যা করতে হবে। অন্যথায় কুরাইশরা 'প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ' গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য, মদীনার মুসলমানগণ দুটো দাবীর কোনটিই গ্রহণ করতে পারেননি। চরমপত্রের শেষ লাইনে 'প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ' বলে যে আল্টিমেটাম দেয়া হয়েছিল, কোন অজ্ঞ ও অদক্ষ শাসক সেটি অবহেলা করতে পারেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ স. ছিলেন এমন ব্যক্তি যিনি এসেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেতে এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতে শক্তিশালী শত্রুর মোকাবেলা কিভাবে করতে হবে এবং কিভাবে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে হবে সে বিষয়ে পরবর্তী শাসকবর্গের জন্য গাইডলাইন দিতে। কাজেই তিনি পূর্ব সতর্কতামূলক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমত যে সকল নিঃস্ব মুহাজির শূন্য হাতে মদীনায় এসেছেন তাদের জন্য তিনি থাকার ব্যবস্থা করেন। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে অনেক সমস্যা থাকে। বর্তমান আধুনিক বিশ্বেও বিপুল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও শরনার্থী সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান করা সম্ভব হয়নি। অনেক দেশ এ সমস্যা মোকাবেলা করছে। বস্তুত শরণার্থী সমস্যা সমাধান করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

যারা প্রাথমিক পর্যায়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না- সম্ভবত কয়েক শ' হবে। কিন্তু সম্পদ ছিল তখন খুবই সীমিত। সে সময় মদীনার মত একটি ছোট শহরে কয়েকশ লোকের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা কোনক্রমেই সহজ কাজ ছিল না। বর্তমান সময়ে কয়েক মিলিয়ন লোকের পূণর্বাসন করা যেমন কঠিন সেটিও সে সময় তেমনি কঠিন ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ স. তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বলে অনতিবিলম্বে বিষয়টির সুরাহা করেন। তিনি মদীনাবাসীদের মধ্যে যারা তুলনামূলকভাবে সম্পদশালী ছিলেন তাদেরকে এবং পাশাপাশি মক্কা থেকে হিজরত করে আসা পরিবারগুলো থেকে পরিবার-প্রধানদেরকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান। যখন

দু'পক্ষই রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে সমবেত হলেন, তখন তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করে মক্কার মুহাজিরগণকে তাদের কাছে আমানত হিসাবে অর্পণ করেন এ কথা বলে যে, 'এরা তোমাদের মু'মিন ভাই। এরা ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে এদের ভিটেমাটি ও দেশ ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। এ অবস্থায় মদীনার মুসলিমদের দায়িত্ব হল এদেরকে সহযোগিতা করা।' তিনি এ বিষয়ে প্রস্তাব করেন যে, মদীনার প্রতিটি আনসার পরিবার একটি করে মুহাজির পরিবারকে আশ্রয় দেবে।
এ ভ্রাতৃত্বের ধারণা পরাশ্রয়ী ও পরজীবী হওয়াকে উৎসাহিত করার জন্য নয়, যেখানে পরজীবী হয়ে তাঁরা (মক্কার মুহাজিরগণ) কেবল আশ্রয়দাতাদের দয়ার উপর নির্ভর করে চলবেন, বরং উদ্দেশ্য ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিবারকে বৃহত্তর আকারে রূপদান করা। এ জন্যই রসূলুল্লাহ স. বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে দিয়ে বলেন, যে পরিবারে দু'জন সদস্য আছে, সেখানে আরো দুজনকে অন্তর্ভুক্ত করে নাও। সবাই এবার এক সঙ্গে কাজ করবে। এভাবে তোমাদের উপার্জন দ্বিগুণ হবে এবং সবার জীবনমান উন্নত হবে একই মাত্রায়। কেউ কারো উপর বোঝা হবে না।' সকলেই রসূলুল্লাহ স.-এর প্রস্তাব সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন। এভাবে অল্প কয়েকশ পরিবারের সমস্যা -যারা নিজেরা নিজেদের সহযোগিতা করতে সক্ষম ছিলেন -সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের নীতির মাধ্যমে দ্রুত সমাধা হয়ে যায়। এ সমস্যা সমাধানের ফলে বিত্তশালী ও নিঃস্ব এ দুয়ের ব্যবধান ঘুচে যায়। মুহাজির ও তাঁদেরকে আশ্রয়দাতা স্থানীয় মদীনাবাসী মিলে একক সমাজ সৃষ্টি হয়। শরণার্থী ও দেশীয় এ দুয়ের পার্থক্য কোন রকম বিভেদ-রেখা সৃষ্টি করতে পারেনি।
এ কঠিন ও জটিল সমস্যা সমাধা করার পর রসূলুল্লাহ স. আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেন। সেটি হল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গোড়া পত্তন। মদীনায় রসূলুল্লাহর স. হিজরতের পূর্বে সেখানে কোন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অস্তিত্ব ছিল না। সেখানকার অধিবাসীরা কতগুলো উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। সেখানে প্রায় ৩০টি উপজাতি ছিল। প্রতিটি উপজাতি আধুনিক কালের জাতি-রাষ্ট্রের মত স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসিত ছিল। ফলাফল ছিল সার্বক্ষণিক পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। ঐতিহাসিকগণ বলেন, মদীনার আনসারগণ দুটি প্রধান উপজাতির সমন্বয়ে গঠিত ছিলেন; (মূলত দুটি বৃহৎ গোষ্ঠী বা দল, যার প্রতিটি আবার অনেকগুলো উপদলে বিভক্ত ছিল।) এ দুটো উপজাতি হল আওস ও খাযরাজ। সেখানে একশ' বিশ বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলছিল। বলা বাহুল্য, সেখানে এ পরিস্থিতিতে কোন সাধারণ বা একক সরকারের অস্তিত্ব ছিল না। এ সকল আরব ছাড়াও অন্য এলাকার জনগোষ্ঠি যেমন ইহুদি সম্প্রদায়ও সেখানে বাস করত। এরা ছিল বেশ কয়েক হাজার, মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক, বাকী অর্ধেক ছিল আরব। অল্প কিছু সংখ্যক ছিল খ্রিস্টান যাদের প্রকৃত সংখ্যা-শক্তি অজানা। এক হিসাবে জানা যায় এরা ছিল মাত্র ১৫ জন, আবার আরেক হিসাবে ৫০ জন। তবে সংখ্যা যাই হোক, তারা ছিল আওস সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন

এ ধরনের অসম অসমঞ্জস সম্প্রদায়গুলোর সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। অথচ এটির সত্যিই খুব দরকার ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে শরণার্থী

সমস্যার সমাধান করার পর রসূলুল্লাহ স. এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি মদীনার মুসলমান ও ইহুদিদের সকল উপদলের প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠান। বুখারী শরীফে হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, এ সভাটি হযরত আনাসের রা. পিতার গৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে অন্যান্যের মধ্যে ইহুদি ও আরবদের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত হয়। আরব প্রতিনিধি দলটি মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র আউস ও খাযরাজের সকল গোত্র এবং মুহাজিরদের প্রতিনিধিত্ব করছিল। সে সভায় রসূলুল্লাহ স. সবাইকে উদ্দেশ্য করে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন–

'বর্তমানে আপনারা বিভিন্ন উপজাতি বা উপদলে বিভক্ত। প্রতিটি উপদল একে অপর থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। এর ফলে দেখা যায়, আপনাদের কেউ একজন কোন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে অন্য সকলে থাকেন নিরপেক্ষ ও নিশ্চেষ্ট এবং এ অবস্থায় যে উপদলটির সদস্য আক্রান্ত হয়, সে উপদলটিকে একা হামলাকারীর সম্মিলিত শক্তির মোকাবেলা করতে হয়। পরিণতিতে উপদলগুলো এভাবে (বারবার মোকাবেলা করতে গিয়ে) পরাজিত হতে পারে এবং একটির পর একটি দল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এর চেয়ে কি এটি ভাল হবে না, আপনারা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি একক সরকার গঠন করবেন, যেন শত্রু এটা বুঝতে পারে যে, (যদি আক্রমণ করতে আসে তবে তাদেরকে) মদীনার সকল দলের সম্মিলিত শক্তিকে মোকাবেলা করতে হবে? সুতরাং আমাদেরকে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া উচিত যেটি আমাদের সকলকে শত্রুর মোকাবেলায় নিরাপত্তা দেবে এবং স্বাক্ষরকারী সকল পক্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করবে।'

প্রস্তাবটি ছিল যুক্তিসঙ্গত। ফলে সকল, অন্তত অধিকাংশ উপদল প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নেয়। আমি 'অধিকাংশ' শব্দটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি। কারণ আউস গোত্রের অন্তত চারটি উপদল প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেনি।

মদীনাবাসীকে সমবেত করার এটিই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা মদীনার এ শাসনতন্ত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষ করেছি, যে ব্যাপারে সকলে একমত হয়েছিল। সেটি হল অধিকাংশ বিষয়ে পূর্বের মতই উপদলগুলোর হাতেই স্বায়ত্বশাসন থাকবে, কেবল কয়েকটি বিষয় 'কেন্দ্রীয়' কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এমন একটি বিষয় হল প্রতিরক্ষা। যুদ্ধ ও শান্তিকে অবিচ্ছেদ্য বলে ঘোষণা করা হয়। উপদলগুলো এখন থেকে আর এককভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না, তেমনি তারা শান্তি চুক্তিও করতে পারবে না। প্রতিরক্ষার বিষয়টি এখন থেকে একটি যৌথ দায়িত্বে পরিণত হয়। বহিশত্রুর বিরুদ্ধে এটি ছিল যেন একটি বীমা ব্যবস্থা।

বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উপদলীয় পূর্বতন ব্যবস্থাই অনেকাংশে অক্ষুণ্ন ছিল। তবে উপদলগুলোর পরস্পরের মধ্যে কোন বিতর্ক দেখা দিলে সেটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের বিধান রাখা হয়। যাকে আপিল আদালত বলা যায়। অর্থাৎ শহরের শাসক বা কর্তৃপক্ষের কাছে যাবে মানুষ শেষ আশ্রয় হিসাবে। চুক্তিটিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার একটি ধারাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহুদিগণ তাদের ধর্ম (দীন) পালন করবে আর মুসলমানগণ তাদের ধর্ম। এখানে 'দীন' বলতে বুঝানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট ধর্ম, আইন ও বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি সবকিছুর সমষ্টিকে।

এ দলিলটি মোট বায়ান্নটি ধারায় বিভক্ত ছিল, যেগুলোর প্রতিটি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। এটিকেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়।

একটু আগে আমি বীমার প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলাম। এটি একটি অদ্ভুত ব্যাপার। বর্তমানের প্রয়োজন অতীতের প্রয়োজনের সাথে মিলবে না। তেমনি অতীতের প্রয়োজন বর্তমানে আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হতে পারে। রসূলুল্লাহ স. মদীনায় দুটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রথমত তৎকালীন সমাজে এ বিধান চালু ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে দুর্ঘটনাক্রমে- ইচ্ছাকৃত ভাবে নয়- হত্যা করে, তবে তাকে রক্ত-পণ দিতে হবে। প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুযায়ী এর পরিমাণ এত বিশাল ছিল যা বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকের পক্ষেই কেবল আদায় করা সম্ভব ছিল। সাধারণের জন্য এটি ছিল ক্ষমতার বাইরে। দণ্ডটি ছিল একশ উট (বা তার সম পরিমাণ মূল্য) পরিশোধ। একটিমাত্র উট দিয়ে একশ লোকের একদিনের খাবারের সংস্থান হয়। এ অর্থে একশ উট ব্যয় করার অর্থ হচ্ছে একজন লোককে দশ হাজার দিন খাবার প্রদান। এ ছিল রক্ত-পণের অর্থ মূল্য। এ ধরনের বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পদশালী নেতার পক্ষেই কেবল সম্ভব ছিল এ পরিমাণ অর্থ প্রদান করা। অথচ এ ধরনের ঘটনা ছিল নৈমিত্তিক। এ কারণে সমষ্টিগত ভাবে বীমা বা রক্ত-পণ প্রদানের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। অর্থাৎ কোন হত্যাকান্ডের ঘটনায় শুধুমাত্র হত্যাকারীকে দায়ী করা হবে না বরং হত্যাকারী যে সম্প্রদায়ের লোক তার সমগ্র সম্প্রদায় ঐ অপরাধের অংশীদার বলে গণ্য হবে এবং সমষ্টিগত ভাবে তারা রক্ত-পণ আদায় করবে।

আরেকটি প্রয়োজন ছিল এরূপ-যা বর্তমানকালে অপ্রাসঙ্গিক- কোন বন্দী শত্রুর হাত থেকে সেকালে অর্থের বিনিময়ে স্বাধীনতা ক্রয় করতে পারত। তবে এটিও ছিল খুব চড়া মূল্যের। প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুযায়ী এর পরিমাণও ছিল একশ উট বা তার সম পরিমাণ মূল্য। এর ফলে কোন দরিদ্র বন্দীর পক্ষে মুক্তি অর্জন করা সম্ভব ছিল না। সে প্রকৃত পক্ষে আটককারী ব্যক্তির ক্রীতদাসে পরিণত হতো। এ অবস্থায় কোন বীমা কোম্পানি এগিয়ে আসতে পারতো। এ অবস্থায় রসূলুল্লাহ স. মদীনার প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি করে বিশেষ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন। এদের কাজ ছিল কোন ব্যক্তি নিজে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে বা বন্দী হওয়ার কারণে যদি পণ-মূল্য পরিশোধ করতে অপারগ হতো, তবে এরা তার পক্ষে এ পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করে দিত। যদি কোন ইউনিট এরূপ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হতো তবে পার্শ্ববর্তী ইউনিটকে সাহায্য করার জন্য বলা হতো। যখন সকল ইউনিট মিলেও দাবী মিটাতে ব্যর্থ হতো, তখন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সাহায্য করতো। মদীনায় এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল এবং এ বিষয়টি লিখিত সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

মদীনার এ সাংবিধানিক দলিলটি ছিল আনুষ্ঠানিক ভাবে হাদীস লিখে রাখার অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত।

মদীনা রাষ্ট্র

ভ্রাতৃত্ব পদ্ধতি মুহাজিরগণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এবার নগর রাষ্ট্রের পত্তন হয়। এ রাষ্ট্রটি একটিমাত্র নগরকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আইন শৃঙখলা, বিচার এবং অন্যান্য প্রয়োজনগুলো

পূরণ করে। তবে রসূলুল্লাহ স. এটুকুতেই ক্ষান্ত হননি। মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে আল্টিমেটাম দেবার প্রেক্ষিতে তিনি মদীনার আশেপাশের এলাকাগুলো পরিদর্শন করেন। তিনি উত্তরাঞ্চলে গিয়ে সেখানকার গোষ্ঠিগুলোকে এ বলে বুঝান যে, যদিও তারা স্বায়ত্বশাসিত এবং স্বাধীন ভাবে চলে, তবে শত্রুর হামলা মোকাবেলার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ একা। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি একটি জোট বা সংঘ-শক্তি গঠন করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন, যে জোটবদ্ধ শক্তি শত্রুর হামলা মোকাবেলার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করবে। এ ধারণা বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং তারা এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। যার ধারাবাহিকতায় একটি মৈত্রী জোট গড়ে উঠে। বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা হয়, যা আমাদের কাছে (পরবর্তীতে) লিখিত মৈত্রী চুক্তির দলিল হিসাবে এসেছে।

রসূলুল্লাহ স. পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলেও অনুরূপ সফর করেন। মোট কথা, তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের কাছে যান এবং এভাবে হিজরতের দ্বিতীয় বছর নাগাদ তিনি বিভিন্ন অমুসলিম সম্প্রদায়কে একই চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ করতে সক্ষম হন। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এভাবে ইসলামের সূচনাকালীন সময়ে গৃহীত এ ধরনের প্রাথমিক উদ্যোগের ফলে মদীনা নগরীতে শান্তি ও সংহতির সৃষ্টি হয় এবং পাশাপাশি নগর রাষ্ট্রটির চারপাশে আন্ত সম্প্রদায়গত একটি বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্কের সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। এর ফলে শত্রু বাহিনী আক্রমণ করতে আসলে প্রথমেই তাদেরকে মদীনার আশেপাশের গোষ্ঠিগুলোর দিক থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হতো। এটি ছিল রাজনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে দক্ষতাপূর্ণ একটি উদ্যোগ যা মদীনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সাহায্য করে।

এগুলো ছাড়াও যে কেউ রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক সম্পাদিত এ ধরনের আরো বহু চুক্তি বা পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কে জানতে পারবেন যেগুলো লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কোনটি একান্তই ব্যক্তিগত পর্যায়ের। যেমন, রসূলুল্লাহ স. একবার এক ক্রীতদাস ক্রয় করেছিলেন। এ লেনদেনের দলিলটিও বিদ্যমান রয়েছে। এতে বিধৃত রয়েছে ক্রীতদাসের মূল্য এবং বিক্রেতার নাম ইত্যাদি। আরেকবার রসূলুল্লাহ স. এক ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করেন। এটিরও দলিল রয়েছে। এতে লেখা ছিল, অমুক ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেয়া হচ্ছে। এখন থেকে তাকে যেন সকলে স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত দেয় এবং ক্রীতদাস হিসাবে তার সাথে যেন আচরণ না করা হয়। আরো পরবর্তী সময়ের– সম্ভবত ৮ম হিজরীর দিকে মক্কার কোন এক অধিবাসীকে উদ্দেশ্য করে লেখা রসূলুল্লাহ স.-এর একটি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। এতে লেখা ছিল, 'চিঠিটির বাহক যখনই আপনার কাছে এসে পৌঁছুবে, সকালে কি সন্ধ্যায় যখনই হোক, তখনই আমার জন্য যমযমের পানি পাঠাবেন।' এমনি ধরনের আরো চিঠির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, যেগুলো আরো পরবর্তী সময়ে যখন ইসলামী রাষ্ট্রের আকার বৃদ্ধি পায়, তখন বিভিন্ন জেলা ও প্রদেশের গভর্নর বা শাসকগণের কাছে প্রেরণ করা হয়। জবাবে গভর্নর ও শাসকবৃন্দ বিশেষ কিছু বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা চান যা মদীনা থেকে প্রদত্ত হয়। মোট কথা, এ রকম বহু সংখ্যক দাপ্তরিক দলিল সংরক্ষিত রয়েছে। রসূলুল্লাহ স.-এর অন্তত চার শ চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে কিছু ইসলাম প্রচার সম্পর্কিত, যেগুলো তৎকালীন শাসক কায়সার ও কিসরা প্রমুখকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান সম্বলিত চিঠি। অন্য দিকে কিছু ছিল বিভিন্ন জোট গঠন সম্পর্কিত চুক্তির বিবরণ।

এখন আমরা লিখিত হাদীসের আরেকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। এগুলো হচ্ছে সাধারণ হাদীস সম্পর্কিত; রাষ্ট্রীয় দলিলাদি নয়। এগুলো সাহাবায়ে কিরাম ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংকলন করতে শুরু করেন। অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু তাঁরা ছিলেন ভাল এবং একনিষ্ঠ মুসলমান। যখন তাঁরা মদীনায় ছিলেন তখন তাঁরা প্রায়ই মসজিদে নববীতে যেতেন। তাঁরা সেখানে রসূলুল্লাহ স.-এর কথা শুনতেন এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতেন।

হাদীস সংগ্রহের সূচনা

একটি ঘটনাকে হাদীস সংগ্রহ ও তা লিখে রাখার সূচনা বিন্দু বলে মনে করা হয়। তিরমিযি শরীফে এর বিবরণ রয়েছে। ঘটনাটি এক সাহাবীর সাথে সম্পর্কিত, যার নাম অবশ্য উল্লেখ করা হয়নি। তিনি একদিন রসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে এসে বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ স.! আপনি প্রতিদিন আমাদেরকে যে কথাগুলো বলেন তা অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক, গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় কথা। কিন্তু আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ফলে আমি প্রায়ই এগুলো ভুলে যাই। এখন আমি কী করব?' জবাবে আল্লাহ্‌র রসূল স. বললেন, 'তোমার ডান হাতের সাহায্য নাও।' অর্থাৎ 'কথাগুলো লিখে রাখ।' তখন সম্ভবত ঐ সাহাবী রসূলুল্লাহ স.-এর এই নির্দেশকে কাজে লাগিয়েছেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছে তা জানা যায়নি।

আরেকটি ঘটনা রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. সম্পর্কিত যা হাদীস লিখে রাখার অনুমতি প্রদানেরই ফল বলে মনে হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ছিলেন ১৬/১৭ বছর বয়সী বুদ্ধিদীপ্ত, অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং গভীর বিদ্যোৎসাহী এক তরুণ। পরবর্তীতে তিনি ইনজীল পড়ার জন্য আরামাইক ভাষা শিখেন। রসূলুল্লাহ স. নিজেও তাঁকে পড়াশোনার ব্যাপারে উৎসাহ দেন। হযরত আব্দুল্লাহ যখন জানতে পারলেন, রসূলুল্লাহ স. জনৈক সাহাবীকে হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছেন, তিনিও তখন হাদীস লিখে রাখতে শুরু করলেন। অতপর তিনি যা কিছু রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে শুনতে পেতেন তা লিখে রাখতেন।

মাত্র কয়েকদিন পর্যন্ত হযরত আব্দুল্লাহ রা. এভাবে সবকিছু লিখে রাখতেন। এ সময় তাঁর বন্ধুস্থানীয়রা তাঁকে বললেন, 'রসূলুল্লাহ স. একান্তই একজন মানুষ। তিনি কখনো হাসিখুশী থাকেন, কখনো রাগান্বিত হন। সুতরাং তিনি যে কোন অবস্থায় যা কিছু উচ্চারণ করেন তার সব কিছু লিখে রাখা ঠিক নয়।' অন্য কেউ হলে হয়ত তাদের এ পরামর্শের পর রসূলুল্লাহ স.-এর কথা লিখে রাখা ত্যাগ করতো। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি ভাবলেন, তাঁর বন্ধুদের কথা শোনার চেয়ে যিনি মূল সূত্র (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স.) এ ব্যাপারে তাঁর কাছেই সরাসরি যাওয়া উচিত। যথারীতি তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জানতে চাইলেন। জবাবে আল্লাহর রসূল স. তাঁকে হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দিলেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ রা. জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি যখন রাগান্বিত থাকেন, আপনার সে সময়ের কথাও কি লিখে রাখব?' তখন রসূলুল্লাহ স. জবাবে বললেন, 'সেই সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, এখান থেকে (নিজের মুখের দিকে ইশারা করে বলেন) যা কিছু বের হয়, তার সবই সত্য এবং হক।'

এ বিবরণ থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. যে হাদীসগুলো লিখে রেখেছেন তা মনের পূর্ণ প্রশান্তি নিয়ে লিখেছেন। কিছু কিছু বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা দশ হাজারের মত। তাঁর সংগৃহীত হাদীসের পাণ্ডুলিপি থেকে তাঁর সন্তান-সন্ততিরা তাদের অধস্তনদের হাদীসের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে এক পর্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের রা. দৌহিত্র হযরত আমর ইবনে শুআইব ইবনে আব্দুল্লাহ বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হয়েছিলেন।

এ ধরনের ঘটনার আরো উদাহরণ রয়েছে। যেমনঃ আবু রাফি ছিলেন একজন ক্রীতদাস যিনি পরে স্বাধীন হন। তিনিও রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে হাদীস লিখে রাখার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হয়। তিনিও নিশ্চয়ই কিছু হাদীসের সংকলন করেছেন। এ ধরনের রিওয়ায়েতকারীদের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হিজরতের সময় মাত্র দশ বছরের বালক ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম মাতাপিতার সন্তান। হযরত আনাস রা. নিজে বর্ণনা করেছেন, তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তাঁর হাতে তুলে দেন এবং তিনি গর্বের সাথে জানান যে, তাঁর সন্তান লিখতে ও পড়তে জানে। অতপর তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে অনুরোধ করেন, তিনি যেন তাঁর সন্তানকে তাঁর স. খিদমতের জন্য কবুল করে তাঁকে সম্মানিত করেন। হযরত আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর মাতার অনুরোধ গ্রহণ করেন এবং হযরত আনাস রসূলুল্লাহ স.-এর বাড়িতে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত অবস্থান করার সুযোগ লাভ করেন। দীর্ঘ দশ বছরকাল ব্যাপী তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নানা দিক কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করার বিরল সুযোগ লাভ করেন। তিনি দেখেছেন রসূলুল্লাহ স. মসজিদে গিয়ে কী করেছেন, আবার গৃহ অভ্যন্তরে তাঁর স্ত্রীগণের সাথে কিভাবে আচরণ করেছেন। একই সাথে তিনি দীর্ঘদিন লক্ষ করেছেন রসূলুল্লাহ স. কী খেয়েছেন বা কিভাবে ঘুমিয়েছেন ইত্যাদি। মোট কথা তিনি তাঁর সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ করেছেন।

বলা বাহুল্য, এমনকি প্রথম সারির সাহাবীগণও এ ধরনের সুযোগ পাননি। যেমন হযরত আবু বকর রা. এবং হযরত উমর রা.ও রসূলুল্লাহ স.-এর জীবনাচার এত কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাননি। হযরত আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তেকালের পর মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এরা সকলেই তখন রসূলুল্লাহ স.-এর জীবন সম্পর্কে জানার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী (রসূলুল্লাহ স. সম্পর্কে জানার জন্য) হযরত আনাসের কাছে আসতেন। এ রকম ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বাক্স থেকে একটি পুরনো পাণ্ডুলিপি বের করতেন। তিনি বলেন, রসূলুলাহ স.-এর কাছে থেকে তিনি বিভিন্ন সময় যা কিছু দেখেছেন সেগুলো তিনি এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে পেশ করেছেন। রসূলুলাহ স. সেগুলো দেখে যদি কোন কথা ছুটে গিয়ে থাকে অথবা কোথাও ভুল থেকে যায় তবে সেগুলো সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁর এরূপ সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা অবশ্যই অন্যূন কয়েক হাজার হবে। হযরত আনাস রা.-এর এ সংগ্রহকে হাদীসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংকলন বলা যায়। কেননা স্বয়ং আল্লাহর রসূল স. বর্ণনাকারীর কাছে থেকে শোনার পর প্রয়োজন মত এর সংশোধন করে দিয়েছেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে হাদীস সংকলন

উপরোক্ত ধরনের আরো উদাহরণ রয়েছে। রসূলুলাহ স.-এর জীবদ্দশায় তাঁর অনুমতিক্রমে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী র. এর এ ধরনের সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা দু হাজারের বেশি নয়। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.-এর সংকলিত হাদীসের সংখ্যা দশ হাজার। আপনি নিজে ধারণা করে নিতে পারেন, এভাবে কত বিপুল সংখ্যক হাদীস রসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় লিখে রাখা হয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলো, সে সব হাদীসের সবগুলো গ্রন্থ আকারে আমাদের কাছে নেই। পরবর্তী সময়ে সংকলকগণ হাদীসগুলোকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের রা. সংকলনের কিছু হাদীসকে তারা একটি অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন আবার অন্য কিছু হাদীসকে আরেকটি অধ্যায়ভুক্ত করেছেন। এর ফলে প্রকৃতপক্ষে তাঁর আদি সংকলনটি আমাদের হস্তগত হতে পারেনি।

যা হোক, এটি খুবই পরিষ্কার যে, হাদীস সংগ্রহের ধারা বা প্রক্রিয়া স্বয়ং রসূলুলাহ স.-এর জীবদ্দশায় শুরু হয় এবং তাতে পরিবর্ধন ও সংযুক্তিও সর্বদা চলতে থাকে। রসূলুলাহ স.-এর ইন্তেকালের পর সাহাবীদের সে পক্ষ ক্রমশ ভারী হয়ে ওঠে, যারা তাঁদের স্মৃতিগুলোকে লিপিবদ্ধ করে ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। তাঁরা কিন্তু রসূলুলাহ স.-এর জীবদ্দশায় এ রকম কথা চিন্তা করেননি। তবে তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁরা উপলব্ধি করেন, যদি (যথাযথ ভাবে) সংরক্ষণ করে না রাখা হয়, তবে রসূলুলাহ স.-এর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারগুলো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অবশিষ্ট থাকবে না, বরং হারিয়ে যাবে। আমরা হাদীস সংকলনের গ্রন্থাদিতে এমন হাদীস সংগ্রহের বহু উদাহরণ দেখতে পাই। যেমন সামুরা ইবনে জুনদুব রা., আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., সা'দ ইবনে উবাদা রা.সহ এমনি আরো বহু সাহাবী যারা হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। এ সব সংগ্রহের কোন একটি সম্পর্কে হাদীস বিশারদ ইবনে হাজার আসকালানী র. 'এতে বিশাল জ্ঞান রয়েছে' বলে মন্তব্য করেন। আবার আরেকটি সংকলন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এটি বিশালায়তনের...।'

সাহাবীদের রিওয়ায়েত

এগুলোও ছিল এক ধরনের সংগৃহীত হাদীস। আরেক প্রকার ছিল যা সমকালীন ও পরবর্তী প্রজন্ম সাহাবীগণের কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেছে। বিষয়টি ছিল এ রকম- কোন ব্যক্তির হয়ত কোন বিষয়ে কিছু জানার প্রয়োজন হল। তখন তিনি কোন বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীর কাছে এ বিষয়ে লিখে পাঠান এ আশায় যে, তিনি হয়ত এ সম্পর্কে সঠিক জানেন। তখন ঐ সাহাবী এ মর্মে লিখে পাঠান যে, তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে এ বিষয়ে এ রকম বলতে শুনেছেন বা এ রকম করতে দেখেছেন। এভাবে বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীগণের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে হাদীস সংগ্রহ ও যাচাই বাছাই করার কাজ অব্যাহত ছিল। এমন সাহাবীগণের মধ্যে রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রী হযরত আয়েশার রা. মত সম্মানিত নাম আমরা দেখতে পাই। তিনি প্রতিনিয়ত এমন বহু সংখ্যক জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতেন এবং তিনি সব সময় এগুলোর জবাব দিতেন। এমন আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফ রা.। সহীহ বুখারী শরীফে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি যখনই এ রকম জিজ্ঞাসা সম্বলিত চিঠি

পেতেন তৎক্ষণাৎ তার জবাব দিতেন। একই রকম অবস্থা ছিল হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. এর ক্ষেত্রে। জনসাধারণ উমাইয়া খলীফা হযরত মুআবিয়া রা.-কেও এ ক্ষেত্রে পছন্দ করত। তারা গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত সম্পর্কে জানতে তাঁর কাছে নিয়মিত লিখে পাঠাতো।

সাহাবীদের দ্বারা উপরে বর্ণিত পন্থায় হাদীস সংগ্রহের সূচনাকালীন সময়ে স্ব স্ব নামে তাঁদের সংগ্রহগুলোর নামকরণ করা হতো। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কোন এক ব্যক্তি কোন শহর থেকে হয়ত হযরত আবু হুরাইরা রা. এর কাছে গেল এবং তাঁর কাছ থেকে শোনা হাদীসগুলো সংগ্রহ করে নিল। তার পক্ষে অন্যান্য শহরে যে সব সাহাবী ছিলেন তাঁদের কাছেও গিয়ে হাদীস শেখা সম্ভব ছিল না। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে হাদীস সংগ্রহের কাজটি ছিল এভাবে এক একজন সাহাবী কেন্দ্রিক। এরূপ বিভিন্ন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ পরবর্তী কালে লিপিবদ্ধ করে ফেলা হয়। অতপর দু বা তিন প্রজন্মের পর সমস্ত হাদীস পন্ডিতগণের জ্ঞানের সীমায় চলে আসে।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে চমৎকার একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। যারা দেরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হযরত আবু হুরাইরা ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি হিজরতের সপ্তম বছর ইসলাম কবুল করেন, রসূল স.-এর অফাতের মাত্র তিন বছর আগে। তবুও বিপুল সংখ্যক হাদীসের বর্ণনার সম্পর্ক তাঁর সাথেই করা হয়। এর ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়েছেন এভাবে- 'অন্য সকল সাহাবী যখন তাদের ব্যবসা বা জীবিকা নিয়ে সারা দিন ব্যস্ত থেকেছেন, তখন আমি মসজিদে নববীতে অবস্থান করেই সন্তুষ্ট থেকেছি। ফলে রসূলুল্লাহ স. যে ধর্মোপদেশ দিয়েছেন তা আমার শোনার যে সুযোগ হয়েছে তা অনেক বিশিষ্ট সাহাবীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি।'

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তীক্ষ্ণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি জ্ঞান অন্বেষণে ছিলেন অত্যোৎসাহী। তিনি লিখতে জানতেন। তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর শেষ জীবনের দিকে তাঁর এক ছাত্র হযরত হাসান ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া আল দুমরি একটি হাদীসের কথা তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন যেটি তিনিই তাঁকে শুনিয়েছিলেন। হযরত আবু হুরাইরা রা. তা স্মরণ করতে পারলেন না। ফলে এ হাদীস তিনি রিওয়ায়েত করেছেন বলে যে কথা বলা হচ্ছে তা তিনি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তিনি ঐ ছাত্রের হাত ধরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, যদি এ হাদীস তিনি বলে থাকেন তবে অবশ্যই এটি তাঁর কাছে লিখিত হাদীস-সংকলনে পাওয়া যাবে। তিনি বাড়িতে এসে আলমারি থেকে হাদীসের একটি ভলিউম টেনে নিলেন। তিনি তার পৃষ্ঠা উল্টে যেতে লাগলেন কিন্তু ঐ হাদীসটি কোথাও পেলেন না। তখন তিনি একটির পর একটি ভলিউম বের করে হাদীসটি খুঁজতে লাগলেন। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে এক পর্যায়ে তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি বলিনি তোমাকে এ হাদীসটি যদি আমি বলে থাকি, তবে অবশ্যই এটা আমার কাছে লিখিত থাকবে? এই তো সে হাদীস! তুমি একদম ঠিক বলেছ!'

হযরত আবু হুরাইরা রা. এর কর্মপদ্ধতি ছিল যথেষ্ট প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং চমৎকার। তিনি তাঁর সকল ছাত্রকে একই বিষয় শিক্ষা দেননি। তিনি তাদের বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন হযরত হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ হযরত আবু হুরাইরার রা. কাছ থেকে শিখে বিশেষ একটি হাদীস সংকলন তৈরি করেন যেখানে প্রায় দেড়শ হাদীস সন্নিবেশিত ছিল। এটি সহীফায়ে হাম্মাম ইবনে

মুনাব্বিহ নামে পরিচিত ছিল। তিনি অন্য কোন ছাত্রের জন্য যদি আরেকটি ভলিউম তৈরি করতেন তবে অবশ্যই সেটি তার নামে পরিচিত হতো। মোট কথা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাজার হাজার হাদীস স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছিলেন এবং পাশাপাশি তাঁর ছাত্রদের জন্য বহু সংখ্যক ভলিউম তিনি সংকলন করেন। সেগুলো এখনও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

হাদীস লেখার উপর নিষেধাজ্ঞা

এমন অনেক হাদীস রয়েছে যাতে দেখা যায় রসূলুল্লাহ স. তাঁর কথা ও কাজের বিবরণ লিখতে নিষেধ করেছেন। আবার অন্যত্র আমরা এমন হাদীস দেখেছি যেখানে তিনি 'ডান হাতের সাহায্য নিতে' বলেছেন অর্থাৎ তিনি যা বলছেন তা লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন; যেহেতু তিনি কোন ভুল কথা বলতে পারেন না। তাহলে এ দু'ধরনের কথার মাঝে কিভাবে আমরা সামঞ্জস্য বিধান করবো? তবে প্রকৃত পক্ষে এ সমস্যা মোটেও থাকেনি।

অনেক সাহাবী বলেছেন, হাদীস লিখে রাখা উচিত নয়। তবে তাঁরা তাঁদের এ কথাটিকে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সম্পর্কিত করেননি অর্থাৎ এটি রসূলুল্লাহ স.-এর কথা -এ কথা তাঁরা বলেননি। এ ক্ষেত্রে সাহাবীদের অভিমত সম্পর্কে আলোচনার পরিবর্তে সে সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত যেখানে সাহাবীগণ কেউ কেউ বলছেন, স্বয়ং রসূলুল্লাহ স. হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনজন সাহাবী দেখতে পাওয়া যায়- একজন হলেন হযরত আবু হুরাইরা রা., যিনি বিপুল সংখ্যক হাদীস লিখে রেখেছিলেন। অন্য দুজন হচ্ছেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. ও হযরত আবু সাইদ আল খুদরী রা.। এঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুজন হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করেছেন মর্মে যে কথা কথিত আছে হাদীসতত্ত্ববিদগণ তা সঠিক নয় বলে নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁরা এ সম্পর্কে বলেন, এখানে মধ্যবর্তী রিওয়ায়েতকারীগণ নির্ভরযোগ্য নন। তারা ভুল করেছেন এবং হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে তাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে একমাত্র হযরত আবু সাইদ আল খুদরী রা. এর বক্তব্য গুরুত্ববহ। কারণ সহীহ মুসলিম শরীফের মত নির্ভরযোগ্য হাদীস সংকলন-গ্রন্থে হযরত আবু সাইদের বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত ধরনের হাদীস এসেছে- 'রসূলুল্লাহ স. তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত হাদীস আমাদেরকে লিখে রাখতে নিষেধ করেছেন এবং যদি কিছু লিখে থাকি সেগুলো মুছে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন।'

উপরের এ হাদীসটির প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় - এ নির্দেশটি কি কেবল বিশেষ একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত এবং তার জন্যই নির্দিষ্ট নাকি এটি সাধারণ বিধান? হাদীস বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মুস্তাফা আল আ'যামী এ বিষয়ে একটি চমৎকার গবেষণালব্ধ তথ্য এনেছেন। তিনি বলেন, ইমাম বুখারী র. মুসলিম শরীফের হাদীসটি গ্রহণ করেননি। ইমাম বুখারী র. বলেন, এটিকে হাদীস বলা হয়েছে কিছু ভুল ধারণার ভিত্তিতে। তিনি বলেন, হযরত আবু সাইদ খুদরীর কথাটি তার ব্যক্তিগত অভিমত, যেটিকে কোন কারণে মধ্যবর্তী রিওয়ায়েতকারীগণ রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সম্পর্কিত করেছেন। হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে এখানে এমন কোন প্রমাণ নেই যার বলে এ হাদীসটির এ বক্তব্য - 'রসূলুল্লাহ স. তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করেছেন' এ কথা সঠিক প্রমাণিত হয়। যদি এটি

ধরেও নেয়া হয় যে, তিনি কখনো এ ধরনের নিষেধসূচক কথা বলেছেন, তবু এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি দূর করা সহজ। সেটি এভাবে যে, তিনি অবশ্যই বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে এ নিষেধ আরোপ করেছেন। কেননা হযরত আবু হুরাইরার রা. উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। তিনি অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। হাদীস শরীফে যা কিছু বিধান এসেছে তিনি তা অত্যন্ত সচেতন ভাবে হুবহু পালন করতেন। কাজেই যদি রসূলুল্লাহ স. হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করতেন তবে অবশ্যই তিনি তাঁর কাছে রক্ষিত বহু সংখ্যক হাদীস লিখে রাখতেন না।

কাজেই এ কথা বলা যায় যে, নিষেধাজ্ঞাসূচক হাদীস সম্ভবত বিশেষ কোন পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত এবং তারই জন্য নির্দিষ্ট। সম্ভাবনা রয়েছে উক্ত হাদীস যখন রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে তখন যে পরিপ্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে সে প্রেক্ষিতটি হাদীসটি বর্ণনার পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনের হাদীস ঐ নির্দিষ্ট দিনে লেখা হয়নি, বরং পরে সাধারণ অনুমতির আওতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই অবশ্যই এখানে কোন নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত রয়েছে। যেমন এক হাদীস অনুযায়ী রসূলুল্লাহ স. একদিন সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে সে সব ঘটনা সম্পর্কে বলছিলেন যে ঘটনাগুলো কিয়ামত দিবসের পূর্বে বিভিন্ন সময় মুসলিমদের জীবনে ঘটবে। তিনি সে সব দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছিলেন যেগুলো মুসলিমগণ জয় করবেন, সে সব ভূমি সম্পর্কে বলছিলেন যেগুলো তারা ভ্রমণ করবেন। এভাবে তিনি আরো বহু ঘটনা সম্পর্কে বলছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তখন কিছু সাহাবী নবীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি মানুষের ভবিষ্যৎ পূর্ব নির্ধারিতই থাকে, তবে কেন মানুষের জন্য চেষ্টা করা বা কষ্ট করা জরুরী হবে? তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন, ঐ চেষ্টা করাটাও পূর্ব নির্ধারিত এবং এটি যে করতে হবে সেটিও নির্ধারিত। সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি ঐ নির্দিষ্ট দিনটিতে (যে দিনে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন) হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করেছেন এ আশংকায় যে, অন্যথায় সাহাবায়ে কিরামদের কেউ কেউ হয়ত এ ধারণা করবেন যে, ভবিষ্যত যেহেতু পূর্ব নির্ধারিত, তাই চেষ্টা করা বৃথা। অথবা এ নিষেধাজ্ঞার পেছনে অন্য কোন কারণও থাকতে পারে।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতের রা. সাথে সম্পর্কিত করে কিছু হাদীস গ্রন্থের কথা বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ তিনি হাদীস গ্রন্থগুলো লিখেছেন মর্মে বলা হয়েছে)। তবে প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে প্রথম সারির বিখ্যাত সাহাবীগণ সম্পর্কে এরূপ গ্রন্থ সংকলনের কথা বর্ণিত নেই, বরং তুলনামূলক কম সংখ্যক সাহাবী সম্পর্কেই এরূপ বলা হয়েছে। সে জন্য এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে, কেন বড় বড় সাহাবীগণ হাদীস লিপিবদ্ধ করেননি? হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জানা যায়, তিনি রসূল স.-এর ইন্তিকালের পর তাঁর অল্প দিনের জীবনে (আড়াই বছর) হাদীসের একটি সংকলন তৈরিতে আত্মনিয়োগ করেন। এতে পাঁচ শ হাদীস সন্নিবেশিত হয়। তিনি পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা রা. এর হাতে তুলে দেন। সে সময় তিনি হযরত আয়েশার বাড়িতে অবস্থান করেন। সে রাত্রে তিনি বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, তাঁর পিতা সে রাত্রে এত অস্থির ছিলেন যে, হযরত আয়েশা ভয় পাচ্ছিলেন পাছে তাঁর পিতা অসুস্থ হয়ে না পড়েন। পরদিন সকালেও তিনি পিতাকে অস্থিরতার কারণ জিজ্ঞাসা করার সাহস পাননি। তখন হযরত আবু বকর রা. নিজেই কথা বললেন। তিনি কন্যাকে ঐ পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন। হযরত আয়েশা পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাছে এনে দিলে

তিনি সেটি পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেললেন। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বললেন, এখানে কিছু হাদীস আছে যেগুলো আমি নিজে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে শুনেছি। এসব হাদীসের সত্যতার ব্যাপারে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারব। কিন্তু এখানে এমন কিছু হাদীসও রয়েছে যেগুলো আমি অন্য সাহাবীর কাছে থেকে শুনেছি। আমার আশংকা এ হাদীসগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে আমি হয়ত হুবহু সে সকল শব্দ ব্যবহার করিনি যেগুলো রসূলুল্লাহ স. নিজে ব্যবহার করেছেন। আমি চাই না এমন কোন একটি শব্দও তাঁর সাথে সম্পর্কিত করতে যেটি প্রকৃত পক্ষে তাঁর নিজস্ব শব্দ নয়, বরং তাঁর মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করার জন্য অন্য কেউ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

হযরত আবু বকর রা.-এর সম্পর্কিত এ হাদীসটি এ বিষয়টিও পরিষ্কার করে যে, যদি রসূলুল্লাহ স. হযরত আবু বকর রা.-কে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে নিষেধ করতেন তবে অবশ্যই তিনি ঐ সংকলন গ্রন্থটি প্রস্তুত করতেন না। আবার তিনি তাঁর নিজের লেখা হাদীসগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলেছিলেন রসূলুল্লাহ স.-এর নিষেধাজ্ঞার কারণে নয়, বরং এ আশংকায় যে, হয়ত তিনি এমন শব্দ রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সম্পর্কিত করেছেন যা প্রকৃত পক্ষে তিনি বলেননি।

অনুরূপ হাদীস হযরত উমর রা. এর সম্পর্কেও বর্ণিত আছে। এক সময় তিনিও হাদীস সংকলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি অনেকের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন এবং তারা সকলে হাদীস লেখার পক্ষে মত দেন। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্কের পর হযরত উমর রা. নিজেই এর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের পূর্বে বিভিন্ন পয়গম্বরের অনুসারীরা তাঁদের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করেছে। তারা পয়গম্বরদের কথা সংরক্ষন করেছে। কিন্তু আল্লাহর কালাম ভুলে গেছে এবং সেখান থেকে বিচ্যুতি শুরু হয়েছে। আমি চাই না কুরআন শরীফের ভাগ্যও একই রকম হোক।'

একবার হযরত উমর রা. হাদীস সংকলনের চিন্তা করেছিলেন তবে পরে সে চিন্তা ত্যাগ করেন। তাঁর এ চিন্তাও এটি প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ স. হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করেননি। কেননা যদি তিনি নিষেধ করতেন তবে হযরত উমর রা. সংকলনের উদ্যোগ নিতেন না। মানুষের মনোযোগ কুরআন শরীফ থেকে যেন সরে না যায় এ জন্য তিনি পরে অবশ্য সে পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

হযরত আলী রা. তাঁর খিলাফতের সময় একবার বলেছিলেন, 'যে একটি দিরহাম ব্যয় করতে পারবে সে যেন একটি কাগজ কিনে নিয়ে আসে। আমি হাদীস বলে যাব এবং সে যেন সেগুলো ঐ কাগজে লিখে নেয়।' একজন সাহাবী বাজারে গিয়ে এক দিরহাম দিয়ে একটি কাগজ কিনে নিয়ে আসলেন। হযরত আলী রা. তাঁর সামনে অনেকগুলো হাদীস বলে গেলেন যেগুলো তাঁর হেফাজতে নিরাপদে রক্ষিত ছিল। এ ঘটনাও প্রমাণ করে রসূল স. হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করেননি। অন্যথায় হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম কখনো হাদীস লিখে রাখার বা কাউকে বলে লিখাতে সাহস করতেন না।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : হাদীস গ্রন্থের সংখ্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে মতদ্বৈততা কেন? সুন্নিদের রয়েছে ছয়টি নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসহ আরো কিছু গ্রন্থ, যে ছয়টি গ্রন্থ সিহাহ সিত্তাহ নামে পরিচিত। কিন্তু

শিয়াগণ এগুলোর সবক'টিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের নিজস্ব গ্রন্থের উপর তারা নির্ভর করে। এমন মত পার্থক্যের কারণ কি?

উত্তর : রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর চার উত্তরসুরী খুলাফায়ে রাশিদীনের পুরো সময়কালে হাদীস সংগ্রহ, সংগৃহীত হাদীসের যথার্থতা বিচার-পর্যালোচনা এবং তা সংরক্ষণের প্রক্রিয়া এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম পর্যন্ত সেগুলো পৌঁছে দেয়ার কাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়নি। এ সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি এ কাজটি একান্তই ব্যক্তিগত উদ্যোগে করেছেন নিজেদের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে। এক মুহূর্তের জন্য ১৫ জন ছাত্রের একটি ক্লাসের কথা কল্পনা করুন। এঁরা তাঁদের শিক্ষকের কাছ থেকে হাদীস বিষয়ে শিখছেন। এটি নিশ্চিত যে, এঁদের প্রত্যেকের শিক্ষা গ্রহণ করার বা বুঝার ক্ষমতা সমান নয়। এ অবস্থায় একই শিক্ষকের কাছে থেকে দুজন ছাত্রের কোন হাদীস শোনার পর দুজন দু রকম ভাবে ঐ হাদীসটি বর্ণনা করবেন। এ পার্থক্য স্বাভাবিক এবং এটি বিশেষ করে সে ক্ষেত্রে দূর করাও সম্ভব নয় যেখানে কোন বক্তব্য বা বিবৃতির বিষয়বস্তু ও তার অবিকল শব্দগুলো হুবহু রিপোর্ট করা না হবে।

এ প্রক্রিয়ায় যে কেউ এমন এক নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন যেখানে কোন একটি শব্দের পরিবর্তন পুরো বক্তব্যের অর্থ বা বিষয়বস্তু বদলে দিতে পারে। এমন হতে পারে যে, একজনের ভালো স্মৃতি শক্তি রয়েছে কিন্তু আরেকজন এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। আবার এমনও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তির জীবনের এক পর্যায়ে ভালো স্মৃতি শক্তি ছিল কিন্তু পরে কোন এক পর্যায়ে সেই স্মৃতিশক্তি অক্ষুণ্ন থাকেনি। অথচ ঐ ব্যক্তি তার শিক্ষাদান অব্যাহত রেখেছেন। এ কারণে আমরা বিভিন্ন হাদীসের মাঝে অসামঞ্জস্য লক্ষ করে থাকি। এর অন্যতম কারণ হতে পারে যে, একজন রিওয়ায়েতকারী কোথাও ভুল করতে পারেন। আবার আরেকটি কারণ হতে পারে এমন, রসূলুল্লাহ স. প্রাথমিক পর্যায়ে কোন একটি বিষয়ে একটি নির্দেশ দিয়েছেন যা পরবর্তী সময়ে রহিত করে তিনি নতুন নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে এমন হতে পারে যে, কোন একজন সাহাবী হয়ত প্রথম নির্দেশটি শুনেছেন কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় নির্দেশটি তাঁর শোনার সুযোগ হয়নি। ফলে এটি নিশ্চিত যে, তাঁর পরে যে সব সাহাবী এ সম্পর্কে হাদীস শুনেছেন তাঁদের সাথে এ সাহাবীর বর্ণনায় পার্থক্য দেখা দেবে। এমন করার কারণ হলো, হয়ত প্রথমোক্ত নির্দেশটি কোন গোষ্ঠীর বিশেষ কোন সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে অথবা অন্য কোন প্রেক্ষিতে দেয়া হয়েছিল যা পরবর্তীতে পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ধরনের একটি উদাহরণের কথা আমরা আগেই বর্ণনা করেছি অর্থাৎ নর ও মাদী খেজুর সম্পর্কিত ঘটনাটি। রসূলুল্লাহ স. এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে এক ধরনের নির্দেশ দিয়ে পরবর্তীতে সে নির্দেশ নিজেই বাতিল করেছেন।

অন্য একটি উদাহরণ রয়েছে যা আরো চমৎকার। কবর পূজা মানব সমাজের একটি সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা। ইসলাম আগমণের পূর্বে আরব দেশেও এর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। এ রীতি বন্ধ করার জন্য রসূলুল্লাহ স. কবরস্তানে যেতে নিষেধ করেন। এর পেছনে মূল কারণ ছিল মানুষকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার কাছে রহমত কামনা করার জন্য উৎসাহিত করা, কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির কাছে নয়। কিছু দিন পর তিনি এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে পূর্বের ধারা পূণর্বহাল করেন- 'শোন, আমি ইতোপূর্বে তোমাদের কবরস্তানে যেতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবরস্তানে যেতে পার।' রসূলুল্লাহ স.-এর মূল

নির্দেশটি বাতিল করে দিয়েছেন এ জন্য নয় যে, তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন, বরং এ জন্য যে, এর পূর্বতন প্রেক্ষিত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত তিনি চেয়েছেন কবরস্তানে গমন থেকে মানুষকে বিরত রাখতে। তবে কবরস্তানে গমনে অন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে। সেটি হল কবর যিয়ারতকারী মনে মনে ভাবতে পারেন যে, তাকেও একদিন মরতে হবে এবং সে জন্যই তার উচিত শেষ পরিণতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ ধরনের চিন্তাকে উৎসাহিত করার জন্যই উপরোক্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এভাবে উপযুক্ত ধর্মীয় নির্দেশনা দানের মাধ্যমে কবর পূজার সম্ভাবনা নির্মূল করা হয়েছে।

মূলত হাদীস সম্পর্কিত মতবিরোধটি হল উপদল (সেকটারিয়ান) ভিত্তিক। এখানে বিভিন্ন উপদলের মধ্যে আবার প্রতিটি উপদলের নিজেদের ভেতরে মতবিরোধের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তবে হাদীস বিশারদগণ এ জাতীয় সমস্যা দূরীকরণে ভুল করেননি। তাঁরা বিভিন্ন ভাবে এ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমনঃ তাঁরা রিওয়ায়েতকারীর ধারাবাহিকতার উপর জোর দিয়েছেন। এ বিষয়টি মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ ভাবে অনুসৃত এবং তাদেরই বৈশিষ্ট্য যা অন্যদের কাছে অপরিচিত। অর্থাৎ আমরা যদি সরাসরি চৌদ্দ শ বছর পুরনো কোন হাদীসের কথা বলি এবং এভাবে কোন একটি বিবৃতিকে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সম্পৃক্ত করি তবে এ উদ্ধৃতিকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হবে। এর বিপরীতে যদি আমরা বলি যে, আমাদের শিক্ষক জনাব 'অ' বলেছেন তার শিক্ষক জনাব আ, ই বা ঈ বলেছেন- এভাবে প্রজন্ম প্রজন্মান্তরের সকল শিক্ষকের নাম পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করে যদি বলি, তিনি বলেছেন যে, তিনি কোন এক সাহাবীর কাছ থেকে শুনেছেন এবং উক্ত সাহাবী বলেছেন যে, তিনি এ কথা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে শুনেছেন, তবে এ উদ্ধৃতি বা বর্ণনা হবে পূর্ণাঙ্গ। হাদীসের গ্রন্থাদিতে প্রতিটি হাদীসের শুরুতে এক দু লাইনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে যেখানে এরূপ কতগুলো নামের পরম্পরা উল্লেখিত রয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীন হাদীস সংকলন-গ্রন্থের অন্যতম বুখারী শরীফে কোন কোন হাদীস বর্ণনা শুরু হয়েছে মধ্যবর্তী তিনজন রিওয়ায়েতকারীর নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে। বুখারী শরীফে এ ধরনের মধ্যবর্তী রিওয়ায়েতকারীর নাম সর্বোচ্চ নয়জন পর্যন্ত রয়েছে এবং এভাবে রিওয়ায়েতকারীর ধারাবাহিকতা রসূলুল্লাহ স. পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে প্রায় তিন শ' বছরের মধ্যে (যখন বুখারী শরীফ সংকলিত হয়েছে তখন) রিওয়ায়েতকারীদের নয়টি প্রজন্ম উক্ত হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

কোন উদ্ধৃতি পরিপূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ সেটি যাচাই করে দেখার জন্য আমাদের দরকার রিওয়ায়েতকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত তাঁদের জীবনীগ্রন্থ। যেমন, কোন হাদীসের বিবরণে এমন রিওয়ায়েতকারীর নাম পাওয়া গেল যারা হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর ছাত্র ছিলেন। এ রকম ক্ষেত্রে যদি আমরা এমন বিবরণ দেখতে পাই যেখানে A, B অথবা C হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেছেন ....', তবে এমন ক্ষেত্রে রিওয়ায়েতকারীদের জীবনীগ্রন্থের সহায়তায় যে কেউ বলতে পারেন, 'যেহেতু এ কথা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, এখানে সকল রিওয়ায়েতকারী নির্ভরযোগ্য এবং তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক হল ছাত্র ও শিক্ষকের সুতরাং আলোচ্য হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।' পাশাপাশি প্রত্যেকে রিওয়ায়েতকারীর চরিত্র সম্পর্কেও যাচাই করতে হবে।

অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকের নির্ভরযোগ্যতা, তাঁদের স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি সম্পর্কেও মূল্যায়ন করতে হবে। উপরন্তু এটিও অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, এঁদের মধ্যে কে শিক্ষক ও কে ছাত্র। এভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে এ জন্যে, যেন রিওয়ায়েতকারীদের যে উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে সেটি কল্পনাপ্রসূত নাকি বাস্তবভিত্তিক তা আমরা রিওয়ায়েতকারীদের জীবনী গ্রন্থের সহায়তায় সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারি।

এরপর হাদীসের মূলনীতি শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে। এ শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ এমন কিছু গাইডলাইন সৃষ্টি করে দিয়েছে যার মাধ্যমে যে কেউ কোন হাদীস সাধারণ জ্ঞান বা যুক্তির পরিপন্থী কিনা তা যাচাই করে নিতে পারেন। একইভাবে অন্যান্য আপাত ত্রুটির ক্ষেত্রেও সমাধানের জন্য বিধি তৈরি করে দিয়েছে এ শাস্ত্র।

মুসলিমগণ এ ক্ষেত্রে মূলত দুটি মৌলনীতি উদ্ভাবন করেছেন। যে কোন হাদীসের যথাযথ ও নির্ভুল বর্ণনা (রেওয়ায়াত) এবং এর যৌক্তিকতা (দিরায়াত)। প্রথম মৌলনীতি অনুযায়ী এটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, বর্ণনাকারীগণ যথার্থ নাকি কাল্পনিক, তারা কি চারিত্রিক শুদ্ধতার অধিকারী অথবা তাদের মিথ্যাবাদীতার দুর্নাম রয়েছে কি-না, তাদের মাঝে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় কিনা ইত্যাদি। যে কোন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাটি বাস্তবভিত্তিক কিনা তা যাচাই করে দেখার জন্য প্রাচীনকাল থেকে এটিই ছিল মাপকাঠি। অন্যদিকে যৌক্তিকতা তথা দিরায়াতের নীতি অনুসারে বর্ণনাটি যৌক্তিক কিনা তা যাচাই করে দেখা হয়।

মনে করুন, বাহাওয়ালপুরে কোন এক সময়ে সংঘটিত কোন এক ঘটনা সম্পর্কিত একটি হাদীস রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে সময়ের ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, সে সময় বাহাওয়ালপুর নামের শহরটি আদৌ ছিল কিনা অবশ্যই সেটি দেখতে হবে। যদি দেখা যায় ঐ সময় এ শহরটির অস্তিত্ব ছিল না, তবে সে ক্ষেত্রে হতে পারে কেউ একজন অনুলেখক ভুলে শহরটির নাম উল্লেখ করেছেন, নয়তো হাদীসটিই জাল। হতে পারে রসূলুল্লাহ স. বাহাওয়ালপুর শব্দটি বলেননি; অন্য কোন শব্দ বলেছেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে শব্দটিতে এক ধরনের বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে এবং এভাবে এটি 'বাহাওয়ালপুর' শব্দে রূপান্ত রিত হয়ে গেছে। এ রকম ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ ধরনের এবং অন্যান্য আরো অনেক প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পেতে হবে। এভাবে আমরা হাদীসের মূলনীতি শাস্ত্রের কিছু নীতি অনুসরণ করে এ ধরনের অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের সমাধান বের করতে পারি।

একই ভাবে দুটি হাদীসের মাঝে আপাত বৈপরিত্য পাওয়া যেতে পারে। হয়ত একটি হাদীস কোন একটি কাজ করার জন্য বলছে, আবার অপর হাদীসটি সেটি করতে নিষেধ করছে। এ সব সমস্যা সমাধানের পন্থা হাদীসের মূলনীতি শাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, হয়ত নির্দেশটি ছিল আগের এবং নিষেধাজ্ঞাটি ছিল পরবর্তী সময়ের। এ ক্ষেত্রে পরের নির্দেশটি স্বাভাবিকভাবেই আগের নির্দেশটি বাতিল করে দেবে। আবার এমনও হতে পারে, একটি হয়ত ছিল সাধারণ নির্দেশ (যা সকল সাধারণ অবস্থার জন্য প্রযোজ্য) আর অন্যটি ছিল বিশেষ পরিস্থিতির জন্য নির্দিষ্ট।

এরূপ প্রতিটি হাদীসের ভেতরগত এবং এক হাদীসের সাথে অন্য হাদীসের মধ্যকার আপাতঃ বিরোধ নিরসনের বিভিন্ন উপায় রয়েছে। মুসলিম পন্ডিতগণ এ বিষয়টির প্রতি যথাযথভাবে মনোযোগ দিয়েছেন। অন্য কোন জাতি এমন কি বিশেষজ্ঞদের কোন একটি দলও এভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সত্যতা যাচাই করেছেন- এমন দাবী করতে পারবেন না। যেমন গসপেলের কথা বলা যায়। বস্তুত গসপেল সংকলন, এর সংরক্ষণ এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এর রূপান্তর সেই পন্থায় ঘটেনি যেভাবে হাদীস সংকলনের গ্রন্থাদি সংকলিত হয়েছে। অন্য দিকে যিশু খৃস্টের তিরোধানের পর তিন শ' বছর অতিক্রান্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত আমরা গসপেল সম্পর্কে শুনিনি। আমরা জানি না কে গসপেলগুলো লিখেছেন, কে এগুলো অনুবাদ করেছেন আর কে এগুলোকে রূপান্তরিত করেছেন। আদি আরামাইক ভাষা থেকে এগুলো কিভাবে গ্রীক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে? এখানে কি অনুলেখকবৃন্দ আদি গসপেলের যথার্থ রূপান্তরিত সংস্করণটি তৈরি করতে পেরেছেন?

সর্বপ্রথম চারটি গসপেলের কথা বলা হয়েছে, যিশু খৃস্টের তিরোধানের তিনশ' বছর পর। আমরা কি বুখারী শরীফের বিপরীতে, যেখানে প্রতিটি হাদীস বর্ণনার পূর্বে দু' তিন লাইনের ক্ষুদ্র ভূমিকায় তিন থেকে নয়জন রিওয়ায়েতকারী সম্পর্কে উল্লেখিত রয়েছে, গসপেলের মত এমন একটি অপ্রমিত (unauthentic) গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে পারি? আমাদের কি নির্ভর করা উচিত হবে? তবে এখানে এমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বুখারী র. যথাযথভাবে সত্যই বর্ণনা করেছেন-এর কী প্রমাণ আছে? এমন কি হতে পারে না যে, তিনি কোন একটি বিবৃতি (অর্থাৎ হাদীস সম্পর্কিত বর্ণনা) নিজে থেকে বানিয়ে তার সাথে কয়েকজন রিওয়ায়েতকারীর নাম জুড়ে দিয়েছেন এবং এভাবে রিওয়ায়েতকারীদের পরম্পরা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ স. পর্যন্ত নিয়ে শেষ করেছেন? এ প্রশ্ন যুক্তির দিক থেকে যথার্থ বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবতার নিরীখে এটি একেবারে ভিত্তিহীন। কারণ যে সব রিওয়ায়েতকারী হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন তাঁদের জীবনী সম্পর্কিত (আস্‌মাউর রিজালের) গ্রন্থাদিও আমাদের সামনে হাজির রয়েছে। আমরা সেখানে অনুসন্ধান করে দেখতে পারি।

অতএব, বুখারী শরীফ সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বুখারী র. বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. তাঁর কাছে কোন একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এ হাদীসটি ইমাম আহমদের কাছে আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেছেন। তিনি এটি শুনেছেন তাঁর শিক্ষক মুয়াম্মারের নিকট। মুয়াম্মার দাবী করেছেন, এটি তাঁর মনিব হাম্মাম ইবনে মুনাব্‌বিহ সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর কাছ থেকে শুনেছেন। হযরত আবু হুরাইরা রা. এটি তাঁর জীবদ্দশায় শুনেছেন সরাসরি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে। আমাদের সামনে বুখারী শরীফ রয়েছে। যদি আমরা মধ্যবর্তী রিওয়ায়েতকারীদের সম্পর্কে জানতে না পারতাম, তবে একাডেমিক অনুশীলন স্বরূপ এরূপ ধরে নিতে পারতাম যে, ইমাম বুখারী র. হয়তো বা অনির্ভরযোগ্য। কিন্তু আমরা যদি ইমাম বুখারীর র. শিক্ষক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের র. সংকলনটিও হাতে পাই এবং আলোচ্য কোন হাদীস সেখানেও হুবহু একই ভাষায় একই ভাবে কোন রকম পার্থক্য ছাড়া দেখতে পাই, (যেমনটি বুখারী শরীফে আছে), তবে সে ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী নির্ভরযোগ্য এ কথা আমাদের মানতেই হবে। কেননা এ রকম ক্ষেত্রে এটিই প্রমাণিত হবে যে, তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের র. বর্ণিত হাদীসটিই হুবহু একই ভাষায় যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আমরা তারপরও আহমদ ইবনে হাম্বলের র. বর্ণনা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারতাম এবং তিনি যে দাবী করেছেন যে, তিনি আব্দুর রাযযাক ইবনে হাম্মামের র. কাছ থেকে উক্ত হাদীস শুনেছেন- এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যেত, যদি না আব্দুর রাযযাকের সংকলনটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত। আল্লাহর শুকর যে, তাঁর সংকলিত 'মুসান্নাফ' এখনও বিদ্যমান এবং এখন এটি ছাপানোও হয়েছে। তিনিও ইমাম বুখারীর র. বর্ণনাটিকে সঠিক বলে নিশ্চিত করেছেন। অনুরূপ ভাবে, সৌভাগ্যক্রমে হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ র.-এর শিক্ষক মুয়াম্মার ইবনে রশিদের সংকলিত গ্রন্থ 'আল-জামি'-ও আমাদের কাছে রয়েছে। এখানেও একই হাদীস হুবহু একই ভাষায় বর্ণিত রয়েছে। হাম্মাম ইবনে মুনাববিহের র. সহীফাও ছাপানো হয়েছে। এটিও আমাদের আলোচ্য বুখারীর র. বর্ণনার সত্যতাকেই নিশ্চিত করে। এভাবে এগুলোর প্রতিটি যদি একই ধরনের বক্তব্য বহন করে, তবে বুখারীর র. সততা নিয়ে আমাদের কুৎসা রটনা করা হবে একান্তই অন্যায় এবং অন্যায্য। এখানে যুক্তির দাবী এটাই যে, আমরা আলোচ্য হাদীসটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করে নিব।

আবার এমনও হাদীস রয়েছে যেখানে একটি অন্যটির যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন, যদি ইমাম তিরমিযী র. অন্য বর্ণনাকারীর পরম্পরার উপর নির্ভর করে (নিজের সংগ্রহের ভিত্তিতে নয়) একটি হাদীস বর্ণনা করেন, তবে সেক্ষেত্রে এ কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের পঞ্চাশজন ব্যক্তি পূর্ব থেকেই নিজেরা একমত হয়ে একটি মিথ্যা কথা বর্ণনা করেছেন। মোট কথা, এগুলো হচ্ছে প্রায়োগিক মৌলনীতি, যেগুলো হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য। অন্য কোন গ্রন্থ, এমন কি অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থ, যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সে ধরনের কঠোর বিধিমালা অনুসরণ করা হয়নি, যেগুলো হাদীসের যথার্থতা নিরূপণে ভূমিকা পালন করেছে।

শিয়া ও সুন্নী হাদীস গ্রন্থে পার্থক্য থাকতে পারে, এ কথা নীতিগতভাবে বলা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবে এটি নিছক ধারণাগত বা অনুমাননির্ভর উক্তি ছাড়া কিছু নয়। হ্যাঁ, এখানে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনাকারীদের পৃথক ধারা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমি হয়ত কোন একটি কথা বললাম এমন এক হাদীসের ভিত্তিতে যেটি হযরত আবু বকর রা.-এর কাছ থেকে শ্রুত। অন্যদিকে ঐ একই হাদীস একজন শিয়া মতাবলম্বী বর্ণনা করলেন হযরত আলী রা. এর বরাত দিয়ে।

সকল শিয়া ও সুন্নী হাদীসে পার্থক্য রয়েছে-এ ধারণা ভুল। পার্থক্য রয়েছে কেবল বর্ণনাকারীদের মধ্যে, তাদের দ্বারা বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুতে নয়। বস্তুত হাদীসগুলোতে খুব কম ক্ষেত্রেই বৈপরীত্য খুঁজে পাওয়া যাবে। এখন পর্যন্ত এমন কোন সুনির্দিষ্ট দলিল পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে এ উপসংহার টানা যাবে যে, কোন বিষয় সম্পর্কে শিয়াদের গ্রন্থাদিতে এক ধরনের নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে, সুন্নীদের গ্রন্থাদিতে ঐ একই বিষয়ে বিপরীতধর্মী সমাধান দেয়া হয়েছে।

আমরা এক্ষেত্রে যে পার্থক্য দেখতে পাই সেটি আসলে অন্য ধরনের। যেমন সুন্নীগণ, বিশেষত হানাফী, শাফিয়ী ও হাম্বলীগণ নামায পড়েন বুকের উপর হাত বেঁধে। কিন্তু শিয়া মতাবলম্বীগণ দেহের দুই পাশে হাত দুটো সোজা ছেড়ে দিয়ে নামায পড়েন। এ পার্থক্য এ জন্যে নয় যে, হাদীস শরীফের ভাষায় হাত বাঁধার ব্যাপারে এ ধরনের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। বরং এ পার্থক্য এ জন্যে যে, খোদ রসূলুল্লাহ্ স. নামায আদায় করেছেন দু'ভাবেই। বিষয়টি উপলব্ধি করা আসলে কঠিন নয়। মনে করুন, কোন এক

যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ স. আহত হয়েছেন। ফলে তিনি হাত বাঁকা করতে বা ভাঁজ করতে পারেন না। এ অবস্থায় তিনি নামায আদায় করতে গেলে হাত দুটো ভাঁজ না করে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কী করতে পারবেন? এখন এ অবস্থায় কেউ একজন তাঁকে এভাবে নামায পড়তে দেখলেন। পরে যখন তিনি আবারো বুকের উপর হাত বাঁধতে শুরু করলেন সেটি দেখার সুযোগ তার হলো না। বলা বাহুল্য, এ ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.- কে যেভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন বা তাঁকে যেভাবে আমল করতে দেখেছেন, তিনি তো সেভাবেই আমল করবেন। এ ব্যাপারটি আমাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। আমি আগে যেমন বললাম, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার এক শিক্ষক এখন থেকে প্রায় ৬৫ বছর পূর্বেই আমাকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমি আজও সে ব্যাখ্যা ভুলতে পারিনি। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার রসূলকে স. ভালোবাসেন। তার রসূলের খাতিরে আল্লাহ রসূলুল্লাহর স. প্রতিটি কাজকে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে বা ধরে রাখতে চেয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে কিছু লোকের মাধ্যমে, যেমন শিয়া সম্প্রদায়, তারা রসূলুল্লাহ স.-এর হাত না বেঁধে নামায পড়ার রীতিটি ধরে রেখেছেন। আবার আরেক দল মানুষের মাধ্যমে তাঁর হাত বেঁধে নামায পড়ার রীতিটিও সংরক্ষণ করেছেন তিনি। অতএব আমলের বা প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য সেটি সংশ্লিষ্ট হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণভাবে রেকর্ড করার কারণে নয়, বরং রসূলুল্লাহ স.-কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে আমল করতে দেখার কারণে উদ্ভূত হয়েছে। অতএব আমাদের পারস্পরিক সহনশীলতার মনোভাব সৃষ্টি করা উচিত।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ না করে আমাদের বরং মনে করা উচিত, রসূলুল্লাহ স. যেন কোন এক ঘটনার বিচারের রায় দিয়েছেন এক রকম। আবার প্রেক্ষিত ভিন্ন হবার কারণে তিনি ঐ বিষয়ে অন্যত্র আরেক রকম রায় দিয়েছেন। আরেকটি উদাহরণের কথা মনে করুন, যা আজকাল খবরের কাগজে দেখা যায়-অর্থাৎ চুরির অভিযোগে হাত কর্তনের বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে সুন্নীগণ বলেন, হাত কবজি পর্যন্ত কাটতে হবে। অন্যদিকে শিয়াগণ শুধু হাতের আঙুলগুলো কেটে ফেলার কথা বলেন। ক্ষণিকের জন্যও এমন ধারণা করবেন না যে, এ পার্থক্য হাদীসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এ জন্য সৃষ্টি হয়েছে। কেননা সুন্নী পন্ডিতদের কাছে রক্ষিত হাদীস-গ্রন্থে এমন হাদীসও রয়েছে, যেখানে রসূলুল্লাহ স. একবার আঙুল কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই এ অবস্থায় একে উপদলীয় (sectarian) কোন্দলের ভিত্তি না বানিয়ে আমাদের উচিত পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহনশীল হবার শিক্ষা গ্রহণ করা। এবং আমাদের উচিত আমাদের নিজ মাযহাব অনুযায়ী হাদীসগুলোর উপর আমল করা। এ ধরনের পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে দূর করার জন্য চেষ্টা করার কিছু নেই। কারণ এ ধরনের পার্থক্য সম্পূর্ণ দূর করা আদৌ সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : হযরত আবু হুরাইরা রা. কি লিখতে পড়তে জানতেন? যদিও তিনি বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনার সঙ্গে জড়িত, তাঁরই এক হাদীসে এসেছে, তিনি নিজে বলতেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস তাঁর থেকে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। কারণ তিনি লিখতে পেরেছিলেন কিন্তু আবু হুরাইরা লিখতে পারেননি।

উত্তর : এ দুটো বক্তব্যের মাঝে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃত ব্যাপার হল, হযরত আবু হুরাইরা রা. কেবল আরবী লিখতে জানতেন তাই নয়, তিনি তৎকালীন আবিসিনীয় ভাষাও জানতেন। তিনি ফার্সী ও

অন্যান্য ভাষাও জানতেন। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তি। তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হযরত আলীর পূর্বেই লিখতে শুরু করেছিলেন। হযরত আবু হুরাইরা রা. এ বিষয়ে আরো পরে চিন্তা করেন। এ কথা সত্য, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বহু সংখ্যক হাদীস সংকলন করেছিলেন, যে হাদীসগুলো হযরত আবু হুরাইরাও রা. জানতেন। তবে এগুলো তাঁর কাছে লিখিত আকারে ছিল না। এছাড়া অন্য একটি ব্যাপার হল, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হযরত আবু হুরাইরার রা. তুলনায় আরো আগের দিকে মক্কার জীবনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্য দিকে হযরত আবু হুরাইরা (রাদি) সপ্তম হিজরীতে ইসলাম কবুল করেন। এ কথা বলা বাহুল্য, যিনি আগে লিখতে বা সংকলন করতে শুরু করেছেন তিনি তুলনামূলক ভাবে বেশি সংখ্যক হাদীস সংকলিত করবেন। অন্য দিকে যিনি লিখতে জানলেও লিখতে শুরু করেছেন আরো পরের দিকে, তার সংকলিত হাদীস-সংখ্যা কম হবে। অতএব দুই বক্তব্যের মাঝে কোন বৈপরিত্য বা বিরোধিতা নেই।

প্রশ্ন : আপনি আপনার বক্তব্যে একটু আগেই বলেছেন, কোন এক সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ! যা কিছু আমার মুখ থেকে বের হয় তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত।' অর্থাৎ বলা যায়, রসূলুল্লাহ স. আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। কিন্তু কিছু কিছু 'উলামা' বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কোন কোন বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করা যায়। কেননা তাঁর সকল উক্তি অমোঘ বা অভ্রান্ত নয়। অনুগ্রহ করে মন্তব্য করুন।

উত্তর : আমি ইতোপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে, যদি কোন বিষয়ে রসূলুল্লাহ স. অহী'র মাধ্যমে জানতে পারতেন, তবে ঐ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য অহী'র ভিত্তিতে প্রদত্ত হতো। যদি এমন হতো, তিনি এখনও অহী'র জন্য অপেক্ষায় আছেন (অর্থাৎ ঐ মুহূর্তে অহী'র আগমন সাময়িক ভাবে বন্ধ রয়েছে), এ অবস্থায় কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হল, তবে তিনি ইজতিহাদের আশ্রয় নিতেন; অর্থাৎ তিনি তাঁর যুক্তি-বুদ্ধি অনুযায়ী নির্দেশনা বা সমাধান দিতেন। এ ক্ষেত্রে আমি আপনাদের সে হাদীসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেখানে তিনি বলছেন, 'আমি যদি এ বিষয়ে অহী পেতাম, তবে তোমাদের সাথে আমি পরামর্শ করতাম না। . . .'

উপরের বর্ণনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, অনেক সময় রসূলুল্লাহ স. অহী'র জন্য অপেক্ষায় থেকেছেন। এ অবস্থায় কোন সমস্যা সামনে আসলে নিজের যুক্তি-বুদ্ধি (ইজতিহাদ) প্রয়োগ করে তিনি তার সমাধান দিয়েছেন। এ রকম পরিস্থিতিতে তিনি যে সব নির্দেশ দিতেন, সেগুলোর কোন কোনটি পরবর্তীতে অহী'র দ্বারা বাতিল হয়ে যেত। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নটি এখানে প্রাসঙ্গিক হিসাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

এ বিষয়টি সামনে আসে বদরের যুদ্ধ জয়ের পর। অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে। অহী'র জন্য রসূলুল্লাহ স. তখন অপেক্ষায় ছিলেন। রসূলুল্লাহ স. সাহাবায়ে কিরামের সাথে যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে কী করা হবে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। হযরত উমর রা. এদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেবার পরামর্শ দেন। কেননা এরা কখনো ইসলাম গ্রহণ করবে না এবং ইসলামের প্রতি চিরবৈরী হয়েই থাকবে। কিন্তু হযরত আবু বকর রা. এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, এদের পরবর্তী বংশধরদের ইসলাম গ্রহণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করেন। এর পরিবর্তে তিনি মুক্তিপণের

বিনিময়ে এদেরকে মুক্তিদানের পরামর্শ দেন। রসূলুল্লাহ স. এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদেরকে মুক্তির নির্দেশ দেন। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সিদ্ধান্ত পছন্দ করেননি। আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, 'ইতোপূর্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি নির্দেশনা না থাকত, তবে আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এর জন্য আপনার কঠিন বিপদ হতো।' (৮ : ৬৮) এভাবে আপনারা দেখতে পেলেন, অহী'র অনুপস্থিতির বিভিন্ন সময় রসূল স. কখনো সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে আবার কখনো বা পরামর্শ ছাড়াই নিজের বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর এ ধরনের কোন কোন সিদ্ধান্ত অহী'র মাধ্যমে পরবর্তীতে বাতিল হয়ে গেছে। বিষয়টি আমি আরো একটু ব্যাখ্যা করতে চাই।

কুরআন শরীফে এমন আয়াত রয়েছে যেখানে পূর্বতন নবী-রসূলগণের আনীত বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার জন্য মুসলিমদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যেমন তাওরাতে এক নির্দেশ রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, শক্রর কাছ থেকে প্রাপ্ত গণিমতের মজুদ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এটি আল্লাহর নিজের। 'এটি পুড়িয়ে ফেল, আল্লাহকে দেয়ার জন্য। নিজের জন্য এটি ব্যবহার করো না।' -তাওরাতে বলা হয়েছে। ইসলামে এ বিষয়ে নতুন কোন নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে এটিই রসূলুল্লাহ স. -এর কাছে আশা করা হয়েছে যেন তিনি পূর্বতন আসমানী বা প্রত্যাদিষ্ট বিধান অনুযায়ী আমল করেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তিনি তা করেননি। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী আসে এ মর্মে- 'যদি ইতোপূর্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা না থাকত, তবে আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার জন্য আপনার কঠিন বিপদ হতো।' (৮ঃ৬৮)। অতএব, যেভাবেই হোক, এ দুটোর মাঝে কোন বিরোধ নেই। সে হাদীসটির কথা মনে করুন, 'যা সত্য নয়, তা আমার মুখ থেকে বের হয় না।' যার অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ স. যা ব্যাখ্যা করেন সেটি হয়তো তিনি অহীর মাধ্যমে লাভ করেন, নয়তো ব্যক্তিগত যুক্তি প্রয়োগ করে পেয়ে থাকেন। যে ভাবেই হোক, তিনি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু বলেন না। তিনি শুধু সে কাজটিকেই ভাল বলেন, যেটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করতে নিষেধ করেননি এবং যেটি সম্ভাব্য সবচেয়ে ভাল উপায় বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উপরোক্ত দুটো বক্তব্যের মাঝে কোন বৈপরিত্য বা বিরোধ নেই।

প্রশ্ন : রসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তিকালের তিনশ' বছর পর হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয়েছে -এরূপ অসত্য প্রচারণায় যারা লিপ্ত তাদের বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি কী?

উত্তর : এ ধরনের লোকেরা সহীহ বুখারীকে - যেটি হিজরী তৃতীয় শতকে সংকলিত হয়েছে - হাদীসের প্রাচীনতম সংকলিত গ্রন্থ বলে মনে করেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তিকালের পর ইমাম বুখারী র.-এর শিক্ষক এবং তাঁর শিক্ষকের শিক্ষকও হাদীস সংগ্রহ করেছেন। এভাবে এ দুটি সময়কালের (রসূলুল্লাহ স.-এর পর থেকে বুখারী র. এর মধ্যকার সময়কাল) মধ্যে সংযোগ সূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কাজেই এ বিষয়ে গোল্ডজিহার যে পুরনো আপত্তিটি তুলেছিলেন সেটি যথার্থ নয়।

আমি এ ব্যাপারে একটি মজার ঘটনা বর্ণনা করতে চাই। কয়েক বছর আগে আমি জার্মানীতে একটি পেপার লিখেছিলাম যেটি সেখানকার একটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ পেপারটিতে আমি এ বিষয়টি নিয়েই লিখেছিলাম। সেখানে আমি এ মত প্রকাশ করেছিলাম যে, রসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তি

কালের তিনশ' বছর পর হাদীস (সর্ব প্রথম) সংকলিত হয়েছে বলে যে পুরনো তত্ত্ব হাজির করা হয় সেটি ক্রমশ অবলুপ্ত হয়েছে। আমার এ লেখাটি ছাপানোর প্রায় ছয় মাস পর একজন জার্মান অধ্যাপক এই একই বিষয়ে আরেকটি নিবন্ধ লেখেন যেখানে হাদীসের 'অনির্ভরযোগ্যতা' প্রমাণের সপক্ষে পুরনো যুক্তিগুলোরই তিনি পুণরাবৃত্তি ঘটান।

কাউকে সমালোচনা বা মন্দ বলা থেকে বিরত থাকা আমার সারা জীবনের অনুসৃত নীতি। আমি এ সব ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করি সেখানে সঠিক তথ্যটি এমনভাবে আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করি, যেন সমালোচক আমার লেখার ভেতরেই তার প্রশ্ন বা আপত্তিগুলোর জবাব খুঁজে পান। যখন ঐ জার্মান অধ্যাপকের লেখাটি ঐ জার্নালেই ছাপা হল, তখন লেখাটির নিচে জার্নাল সম্পাদক একটি পাদটীকা লিখেন, যেখানে তিনি অধ্যাপক মহোদয়কে জার্নালটির অন্য একটি সংখ্যায় ছাপানো এ বিষয়ে আমার লিখিত পূর্বোক্ত নিবন্ধটি পাঠ করার জন্য পরামর্শ দেন। যা হোক, এ সমস্ত ক্ষেত্রে কোন্ নীতিটি অনুসরণ করা উত্তম সেটি এ আলোচনা থেকেই যে কেউ নিজেই নির্ধারণ করে নিতে পারবেন।

প্রশ্ন : হাদীসে কুদসী, যেটি আল্লাহর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, কেন কুরআন শরীফে অন্তর্ভুক্ত হয়নি?

উত্তর : রসূলে মাকবুল স. এমনটি করা দরকার বলে মনে করেননি। যদি এমনটি করা হত, তবে সেটা কুরআন শরীফের কলেবর অনেকখানি বাড়িয়ে দিত। বরং কুরআন শরীফকে তার নিজস্ব আকারে অক্ষুণ্ন রাখাই ছিল ভাল (এবং সেটিই করা হয়েছে)। তবে রসূলুল্লাহ স. যথাযথ গুরুত্ব প্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে কোন কোন বিষয়ে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতেন যা 'সাধারণ হাদীস' ও 'হাদীসে কুদসী' রূপে রেকর্ডকৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারটিতে এমন বিশেষ কিছু নেই যাকে কুরআন শরীফে বাড়তি সংযুক্তি হিসাবে মনে করা হয়। বস্তুত এটি কুরআন শরীফেরই পুনর্বিবরণ।

প্রশ্ন : আপনি ইতোপূর্বে বলেছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় এক ধরনের বীমা ব্যবস্থা চালু ছিল। আপনি কি অনুগ্রহ করে বলবেন বর্তমান যুগের বীমা পদ্ধতি ও তৎকালীন বীমা ব্যবস্থার মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য আছে কি না? কেননা বর্তমানে প্রচলিত বীমা পদ্ধতিকে শরীয়তের বিধান পরিপন্থী বলে মনে করা হয়।

উত্তর : বর্তমানে দু ধরনের বীমা ব্যবস্থা প্রচলিত। একটি হল পুঁজিবাদী, অন্যটি সমবায় ভিত্তিক। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে পুঁজিপতিরা বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্লায়েন্টের জন্য এ পরিমাণ প্রিমিয়াম ধার্য করেন যা তাকে দেয় বীমা পলিসির ঝুঁকির চেয়েও অধিক। পুঁজিপতিরা এভাবে পুরো মুনাফা নিজে নিয়ে নেন। অন্যদিকে শেষোক্ত অর্থাৎ সমবায়ী পদ্ধতিতে ক্লায়েন্ট নিজে মুনাফার অংশ পেয়ে থাকেন। যানবাহন বা গাড়ীর বীমার কথা চিন্তা করুন। ধরুন, পাঁচ শ ব্যক্তি একটি বীমা কোম্পানীর সদস্য হলেন এবং প্রত্যেকে বার্ষিক চাঁদা হিসাবে ১০০ টাকা করে জমা দিলেন। প্রথম বছর কোম্পানীটির আয় গিয়ে দাঁড়াল ৫০,০০০ টাকায়। কিন্তু হয়তো এ সময়ে কোন দুর্ঘটনায় পতিত একজন সদস্যকে মাত্র ২,০০০ টাকা পর্যন্ত বীমার টাকা কোম্পানীটি হস্তান্তর করল। এ ছাড়া কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা বাবদ আরো ১০,০০০ টাকা ব্যয় হল। বাকী টাকা (৩৮,০০০ টাকা) কোম্পানীর হেফাজতে জমা রইল। কাজেই পরের বছর প্রতিজন সদস্যকে বার্ষিক চাঁদা স্বরূপ ১০০ টাকার চেয়ে কম টাকা জমা দিতে হল।

পুঁজিবাদী সমবায় পদ্ধতিতে পুঁজিপতি পুরো মুনাফা নিজের পকেটস্থ করেন। কিন্তু সমবায়ী পদ্ধতিতে বীমাকারীগণ মুনাফার অংশ পেয়ে থাকেন। রসূলুল্লাহ স.-এর যুগের বীমা ব্যবস্থাটি পুঁজিবাদী পদ্ধতির চেয়ে সমবায়ী বীমা পদ্ধতির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। বস্তুত রসূলুল্লাহ স.-এর সময়ের বীমা ব্যবস্থাটি পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল। একেকটি উপজাতি বা গোত্রের প্রতিটি সদস্য গোত্রের নিজস্ব তহবিলে অল্প পরিমাণ অর্থ জমা দিতেন। কোন দুর্ঘটনা ঘটলে যাকে কেন্দ্র করে সমস্যা হয়েছে তার জন্য সঞ্চিত অর্থ থেকে ব্যয় করা হত। পরবর্তীতে ব্যবস্থাটি আরো বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়া হয় এভাবে যে, যদি সংশ্লিষ্ট গোত্রটি প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে না পারে, তবে তারা পার্শ্ববর্তী একটি কমিটির কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারে। যদি উক্ত কমিটির কাছেও প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে, তবে পরিণতিতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষই উক্ত দাবী বা প্রয়োজন পূরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। এই হল বীমা ব্যবস্থার দুটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি। তবে আমি এগুলোর প্রায়োগিক কৌশল সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারব না।

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি কোন অন্যায় করার পর তার দোষ স্বীকার করে নেয়, তবে তাকে এরপরও শাস্তি দেয়া অথবা অর্থদণ্ড (জরিমানা) দেয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি? ক্ষমা করে দেয়া কি ইসলামের নীতি-বিরুদ্ধ কাজ?

উত্তর : আমি ধরে নিচ্ছি আপনি এখানে 'দোষ' (Mistake) বলে আইনত নিষিদ্ধ কোন অপরাধমূলক কাজকেই (Crime) বুঝিয়েছেন। অপরাধমূলক বেআইনী কাজ মূলত দু' ধরনের হতে পারে- একটি হচ্ছে এমন কাজ, যে কাজের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান শরীয়তে বলে দেয়া আছে। একে বলা হয় 'হাদ' (সীমা)। এ ধরনের অপরাধের উদাহরণ হল চুরি, মদ্যপান, হত্যা ইত্যাদি। এ ধরনের সাতটি কি আটটি অপরাধ রয়েছে যেগুলোর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে ক্ষমার কোন সুযোগ নেই। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেউ চুরি করে, তবে তার হাত কেটে ফেলা হবে। সে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তা করা হবে। আবার, হত্যা বা খুনের ক্ষেত্রে বিচারক মৃত্যুদন্ডের কথা ঘোষণা করবেন। তবে এ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়ের এ অধিকার রয়েছে, সে বা তারা বাদীর কাছে রক্তপণের অর্থ দাবী করতে পারে অথবা তাকে সম্পূর্ণ ক্ষমাও করে দিতে পারে। এ সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : পিতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে য়াতীম বা অনাথকে কেন বঞ্চিত করা হয়েছে? এর পেছনে যুক্তি বা কারণ কী?

উত্তর : যে কোন আইন কোন না কোন মৌল নীতিমালার উপর ভিত্তি করে তৈরী হয় আর কোন মৌলনীতি কখনো কখনো কোন ব্যক্তি বিশেষকে আঘাত করতেও পারে। কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণে কোন সাধারণ মৌলনীতি পরিবর্তিত হতে পারে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি হল কোন ব্যক্তি মারা গেলে মৃত ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত কিছু ব্যক্তি কুরআন শরীফে নির্দেশিত সূত্র অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত হয়। এ নীতির প্রেক্ষিতে যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তবে এর প্রতিকারের ব্যবস্থাও কুরআন ও হাদীসে বলে দেয়া হয়েছে। ইসলামে উইল করে সম্পত্তি হস্তান্তর করার সুযোগ সম্বলিত বিধান রয়েছে। এ বিধানের বলে

যে কোন ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে কিছু অংশ এমন ব্যক্তিকে উইল করে দিয়ে দিতে পারে, যে ব্যক্তি অন্য কোন উপায়ে তার (প্রথমোক্ত ব্যক্তির) সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। এভাবে এ ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি হল, সন্তান তার পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। আবার সন্তানের সন্তান অর্থাৎ নাতি তার পিতার কাছ থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, দাদার কাছ থেকে নয়। কিন্তু যেখানে দাদার মৃত্যুর পূর্বেই পিতা মারা গেছে, সেখানে দাদা তার নাতি/নাতনির জন্য সম্পত্তির একটি অংশ উইল করে দিয়ে যেতে পারেন। এ ধরনের বিশেষ পরিস্থিতির জন্য যে ব্যবস্থাটির কথা বলা হল, এটি সাধারণ বিধানকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তাকে রহিত করে দেয়। এ ব্যবস্থাটি সাধারণ নীতি বা আইন পরিবর্তন না করেই এ জাতীয় ব্যক্তি কেন্দ্রিক সমস্যা ও জটিলতার সহজ সমাধান করে দেয়। বস্তুত ইসলামে যে কোন আইনের পেছনে অন্তর্নিহিত দর্শন এ বিষয়টিকে আইনের শর্ত হিসাবে উপস্থাপন করে যে, আইন বা বিধান হওয়া উচিত সকলের জন্য বা সমষ্টি কেন্দ্রিক এবং ব্যতিক্রম কেবল সেখানেই করা উচিত যেখানে ব্যতিক্রমের বাস্তবিক প্রয়োজন রয়েছে বলে অনুভূত হয়।

অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ রাশেদ

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১২, পৃষ্ঠা : ৫৬-৭২

ভূমির মালিকানা : প্রেক্ষিত ইসলাম

ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান

ভূমিকা

ভূমি মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মতে ভূমি হতেই সকল কিছুর উৎপত্তি। আবার এই ভূমিতেই সব কিছু বিলীন হয়ে যাবে। ভূমি বা জমি মানুষের মূল্যবান সম্পদ। ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সৃষ্টির শুরু থেকে সকল দেশে ভূমির ব্যবহার বিদ্যমান। মানব সমাজের ক্রমবিকাশ, ভূমির চাহিদার ক্রমবিকাশ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃংখলা এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভূমি ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ভূমির মালিকানা কার? সৃষ্টির শুরু থেকে এ প্রশ্ন চলে আসছে। এক সময় যে জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি চাষযোগ্য করতো সে তার মালিক বনে যেতো। কিংবা কেউ যদি কোন পরিত্যক্ত জমি বা অন্যের জমি জোর পূর্বক দখল করে নিরবচ্ছিন্নভাবে তা ১২ বছর যাবত ভোগ দখল করতো তবে সে ঐ জমির মালিকানা অর্জন করতো। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের মালিকানাকে স্বীকার করে না। ইসলাম উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিংবা বৈধ উপায়ে উপার্জিত ভূমির মালিককেই প্রকৃত মালিক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ প্রবন্ধে ভূমির পরিচয়, মালিকানা, বিশ্লেষণ, মালিকানা লাভের সাধারণ নিয়ম ইত্যাদি বিষয় স্থান পাবে।

ভূমির পরিচয়

ভূমির একাধিক পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি সংগা প্রদত্ত হলো :

* ভূমি শব্দের অর্থ হল পৃথিবী, ভূ-পৃষ্ঠ, মাটি, মেঝে, ক্ষেত্র, জমি ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে মাটি বা জমির উপরিভাগকে ভূমি বলে।[১]

* ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত প্রাথমিক স্তরের ক্ষয় সাধনের ফলে যে ক্ষুদ্র কণা ভূ-পৃষ্ঠে জমা হয় এবং তার সাথে জৈব পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে যে পদার্থ গঠিত হয় তাই ভূমি বা মাটি।[২]

মৃত্তিকা বা মাটি শব্দের আরবী প্রতিশব্দ 'তুরাব', আর ভূ-পৃষ্ঠ শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে 'আল-আরদ'। 'আরদ' বা ভূ-পৃষ্ঠ বলতে আমরা যে গ্রহে বাস করছি তাকে বোঝায়।[৩]

কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে : 'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না ছাড়পত্র ছাড়া।'[৪]

লেখক : প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা, আলাতুন্নেছা কলেজ, বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা।

ভূ-পৃষ্ঠ দ্বারা বাসগৃহকে বোঝানো হয়েছে কুরআনুল করীমে। বলা হয়েছে : 'তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদের বসতি দান করেছেন।'[৫] কোন কোন আয়াতে 'আরদুন' শব্দটি বিস্তৃত বিছানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে : 'যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তার সাহায্যে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।'[৬]

'আরদুন' শব্দটি মাটি অর্থেও কুরআনুল করীমের বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনো ধৈর্য ধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর– যেন তিনি ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সবজী, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পিঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন। মূসা বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বদল করতে চাও?'[৭]

মানব সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল করীমের ভাষ্য : 'আমি মাটি থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদের ফিরিয়ে দিব এবং এ থেকেই তোমাদের পুনরায় বের করব।'[৮]

মহানবী স. বলেছেন : 'যার ভূমি আছে সে যেন তা চাষ করে। আর যদি সে চাষ করতে অপারগ হয় তাহলে যেন তার ভাইকে (চাষ করার জন্য) দান করে দেয়।'[৯]

তিনি আরও বলেছেন : 'যে ব্যক্তি কোন পতিত অনাবাদি ভূমি আবাদ করবে সে নিজেই সে ভূমির মালিক হবে।'[১০]

এভাবে কুরআনুল করীম ও আল-হাদীসে মানবমজাতিকে ভূমির সদ্ব্যবহার করে রিযিকের ব্যবস্থা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যার স্ফীতি কোন কোন দেশে মাথা পিছু জমির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে বর্তমান বিশ্বের বহু দেশে চাষযোগ্য জমি অনাবাদ পড়ে আছে, যেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারলে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মানব জাতি খানিকটা হলেও মুক্তি লাভ করতে পারতো।

ভূমির মালিকানা

'মালিকানা' অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় মালিকানার ধারণা বিভিন্নরূপ। যেমন

ক. পুঁজিবাদী[১১] অর্থ ব্যবস্থায় মালিকানা বলতে সম্পদের ওপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিরংকুশ, সীমাহীন ও শর্তহীন অধিকারকে বুঝায়।

খ. সমাজতান্ত্রিক[১২] অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা হল রাষ্ট্রের। সরকার রাষ্ট্রের পক্ষ হতে মালিকানা স্বত্ব ভোগ করে থাকে। এ অবস্থায় সম্পদের ওপর ব্যক্তির কোন অধিকার স্বীকার করা হয় না।

গ. পক্ষান্তরে 'মালিকানা'-এর ব্যাপারে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বজনীন নীতি গ্রহণ করেছে, যা পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সংকীর্ণতা ও সীমা লংঘনের ক্রটিমুক্ত। কারণ বস্তুবাদী এই দুই দর্শনের অবস্থান পুরোপুরি দুই মেরুতে। কিন্তু ইসলামে এ ধরনের বস্তুবাদী চিন্তার কোন অবকাশ নেই। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কোন কিছুর মালিকানা যেমন কোন ব্যক্তি বা দলের নয়, তেমনি রাষ্ট্রেরও নয়। বরং ভূমিসহ যাবতীয় সম্পদের প্রকৃত ও নিরঙ্কুশ মালিকানা একমাত্র মহান আল্লাহর। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে : 'আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহরই।'[১৩]

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর যা যাবতীয় বস্তুর মালিক।'[১৪]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ভূমি তথা ধন-সম্পদ ও যাবতীয় কল্যাণকর উপকরণসামগ্রী যত কিছুর অস্তিত্ব আছে– তা মাটি, জমি, নদী-সমুদ্র, পানি, সূর্যতাপ, চন্দ্রের আলো যাই হোক না কেন সব কিছু নিরংকুশভাবে মহান আল্লাহর মালিকানাভুক্ত। এ ব্যাপারে কেউ তাঁর সমতুল্য নেই, কেউ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, এ মালিকানায় কেউ তাঁর সাথে শরীকও নেই।[১৫]

এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, পৃথিবী ও ভূমির প্রকৃত মালিক নিসন্দেহে মহান আল্লাহ। তবে তাঁর মালিকানার অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট সম্পদ ভোগ করবেন। মূলত আল্লাহর মালিকানার অর্থ সৃষ্টি জীবের তত্ত্বাবধানের ও ভোগের অধিকার, আরও একটু সীমিত অর্থে সামাজিক ও তত্ত্বাবধানের ও ব্যবস্থাপনায় ভোগাধিকার।[১৬]

তাই মহান আল্লাহকে ভূমি তথা সম্পদের মূল মালিক ও একক নিয়ন্ত্রক মনে করে মানুষ কেবল ভূমির ভোগাধিকার স্বত্ব লাভ করে। এ ভোগ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষ ভূমি বা সম্পদের মূল মালিক মহান আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ থাকে। সেহেতু মহান আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়ই তাকে ভূমি বা সম্পদ ভোগ করতে হয়। তাই সে এর যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না।[১৭]

ইসলামী অর্থনীতিতে মালিকানা

ইসলামী অর্থনীতিতে মালিকানা দুই প্রকার :

ক. প্রকৃত মালিকানা

খ. ব্যক্তি মালিকানা।

সৃষ্টিকর্তা ও একক নিয়ন্ত্রক হিসাবে সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ এবং পৃথিবীতে তাঁর নিযুক্ত প্রতিনিধি হিসাবে মানুষ এর ব্যক্তিগত মালিক।

ব্যক্তি মালিকানা প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ আবুল কাসেম বলেন, 'মানুষের জীবনই অস্থায়ী। এই অস্থায়ী জীবনে ধন-সম্পদ কখনো স্থায়ী হয় না। মহাকালের মহাসাগরে মানুষ যেন এক একটা অতি ক্ষুদ্র বুদবুদ। এই বুদবুদ অতিশয় অস্থির ও অনিত্য। মহাকালব্যাপী অসংখ্য প্রাকৃতিক সম্পদের সামান্যতম মাত্র ভোগ দখল করতে পারে ব্যক্তি-মানুষ অল্প সমেয়র জন্য। তাই সম্পদের স্থায়ী ও প্রকৃত মালিক আল্লাহ, মানুষ নয়। মানুষ অল্প সময়ের জন্য সীমিতভাবে সম্পদের ব্যবহার করতে পারে মাত্র। যে নিজেই নিজের মালিক নয় সে আবার অপরের মালিক হয় কি করে? তাই মানুষ

শ্রম ও মেধা দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদকে পরিবর্তিত করে ব্যবহার উপযোগী করে তুলে মহাকালের ক্ষুদ্রতম সময়ের আওতায়। অস্থায়ীভাবে সে তার অধিকারী হয় মাত্র কখনো মূল মালিক হয় না। একে 'ব্যক্তি মালিকানা' বা আমানতী মালিকানা বলা হয়।[১৮]

ইসলামে 'ব্যক্তি মালিকানা' বা আমানতী মালিকানা এক বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী। অংকশাস্ত্রে যেমন সাইন ব্যতীত কোন অংকের মান নির্ধারণ হয় না, তেমনি ইসলামের নৈতিক বাধ্যবাধকতা ছাড়া মালিকানা সংগায়িত হয় না। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ ব্যক্তিকে সমাজের সোপান হিসাবে সংগঠিত করতে কার্যত সফল হতে পারেনি। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি এ ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের তুলনায় সর্বতোভাবে সফল। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা মানব দেহে রক্ত কণিকার মতই প্রয়োজনীয় অথচ সমাজতন্ত্রে তা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় লাগামহীন ব্যক্তি মালিকানা বহু অপচয় ও অপবন্টনের জন্য দায়ী। ফলে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় সমাজে ধনী আরও ধনী হয় এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে। ভোক্তার সার্বভৌমত্বের নামে মূল্য ব্যবস্থার আঘাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ শোষিত হয়। অপরদিকে সমাজতন্ত্রে যৌথ মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থার পক্ষে ব্যক্তি মালিকানাকে উপেক্ষা করা হয়। এ ব্যবস্থায় বেকার সমস্যা ও অসম বন্টনের খানিকটা সুরাহা হতে পারে, কিন্তু উৎপাদনে মানুষের অভিনবত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। তাছাড়া সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না। শ্রমিকগণ রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ হিসেবে বেঁচে থাকে। এ দু'টি অর্থ ব্যবস্থা একই রোগের দ্বিবিধ লক্ষণ মাত্র। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ এই দু'প্রান্তিক চরম মতবাদ পরিহার করে মধ্যমপন্থা অনুসরণ করে। এ ব্যবস্থায় উৎপাদনে উৎসাহ, সুষম বন্টন এবং মানবিক মূল্যবোধ সবই অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব।[১৯]

সুতরাং ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে : 'ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে এবং ভালোর সাথে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না; নিশ্চয় তা মহাপাপ।'[২০]

অন্যত্র বলা হয়েছে : 'পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।'[২১]

আরও বলা হয়েছে : 'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দিবে।'[২২]

মহানবী স. বলেছেন : 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ জমি জোর করে দখল করবে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার গলায় সাত স্তর জমি বেড়ি রূপে পরিয়ে দিবেন।'[২৩]

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে নিলেও তা শর্তহীন নয়। বরং ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে স্বীকৃত। সম্পদের কল্যাণকর ও সর্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষে এ শর্তগুলো আরোপ করা হয়েছে। শর্তগুলো হলো :

১. ভূমির নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার : ভূমির নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় মালিকানা রহিত বলে গণ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, হযরত বেলাল ইবনুল হারিস রা.-কে মহানবী স. প্রচুর জমি আবাদ করার জন্য দিয়েছিলেন। হযরত উমর রা. খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁকে ডেকে বললেন, 'মহানবী স. আপনাকে অনেক জমি দিয়েছেন। আর আপনি পুরো জমি চাষাবাদ করতে পারছেন না। অতঃপর বললেন, আপনি বিবেচনা করে দেখুন; যে পরিমাণ জমি আপনি নিজে চাষাবাদ করতে সক্ষম হবেন, সে পরিমাণই আপনি নিজের দখলে রাখুন। আর যা সামলাতে পারবেন না কিংবা যে পরিমাণ জমির ব্যবস্থাপনা করা আপনার পক্ষে সাধ্যাতীত, তা আমাদের (রাষ্ট্রের) নিকট ফেরত দিন, আমরা তা অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেব। হযরত বেলাল রা. তাঁর জমি ফেরত দিতে রাজি না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সাধ্যাতীত পরিমাণ জমি হযরত উমর রা. ফেরত নিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করলেন।'[২৪]

২. ভূমির কল্যাণকর ব্যবহার : ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ মহান আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে হবে। ইসলামী অর্থনীতিতে ভূমি তথা সম্পদের ব্যবহার নীতি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন : 'যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে থাকে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে অতপর যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।'[২৫]

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে : 'তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল, আর যদি গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তা তোমাদের জন্য আরও ভালো।'[২৬]

৩. যাকাত প্রদান : সমাজের যে ক'জন লোক তাদের উচ্চতর যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের কারণে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ আহরণ করেছে ইসলাম চায় তারা যেন এ সম্পদ পুঞ্জিভূত করে না রাখে বরং এগুলো ব্যয় করে এবং এমন সব ক্ষেত্রে ব্যয় করে যেখান থেকে সম্পদের আবর্তনের ফলে সমাজের স্বল্পবিত্ত ভোগীরাও যথেষ্ট অংশ লাভ করতে সক্ষম হয়। এ লক্ষেই ইসলাম যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী নিসাব[২৭] পরিমাণ যাকাত প্রদান করতে হবে।[২৮]

যাকাতের বিধানাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কৃষিজ পণ্যই এর অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। ভূমি একটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান। ভূমি মানুষের রিযক ও জীবন ধারণের মূল উৎস এবং স্থিতি স্থাপনের ক্ষেত্র। এটা যাকাত আইনেরও মূল ভিত্তি। ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা ইনসাফপূর্ণ। ভূমি ব্যবস্থারই অন্যতম দিক হল উশর[২৯] ও খারাজ।[৩০] কোন কোন অবস্থায় উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দেয়া ফরজ হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা বিশ ভাগ দিতে হয়। ইসলামী সরকার কর্তৃক ফসল ও ভূমির উপর আরোপিত করকে উশর ও খারাজ বলা হয়। উশর মুসলমানদের জমির সাথে সংশ্লিষ্ট ও নির্দিষ্ট। অমুসলিমদের জমিতে উশর নেই, আছে খারাজ। উশর মুসলমানদের ওপর কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রামাণ্য ফরয।[৩১]

৪. ভূমির অকল্যাণকর ব্যবহার রোধ : ইসলাম ভূমি তথা সম্পদের কল্যাণমূলক ব্যবহারকে উৎসাহিত এবং অকল্যাণকর ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করেছে। যেহেতু ভূমির প্রকৃত এবং অবিমিশ্র মালিক মহান আল্লাহ, কাজেই এর ব্যবহার করার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে, তবে উক্ত ব্যবহারের ফলে সমাজের অপরাপর ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা অপরের ক্ষতি হলে তা আগ্রাসন হিসাবে বিবেচিত হবে এবং আগ্রাসন সব সময়েই নিষিদ্ধ। কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে : 'হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং এর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্পও করো না।'[৩২]

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী স. বলেছেন : 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রাখা উচিত নয়, তাতে তৃণভূমির উন্নয়ন ব্যাহত হবে।'[৩৩]

এই হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে মুসলমানদের অবশ্যই নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং সমাজের অপরাপর ব্যক্তির যাতে ক্ষতি না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

বহু মুসলিম দেশেই লক্ষ করা যাচ্ছে, ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার সুযোগে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির হাতে দেশের মোট ভূমির বিপুল অংশ কুক্ষিগত হচ্ছে। ইসলামী আইনে এ জাতীয় অবস্থা মোটেই সমর্থিত নয়। কারণ ইসলামী বিধানে ভূমি কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সুবিধার জন্য নয়, বরং সাধারণ জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে হবে। বিশিষ্ট ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ইবনুল কাইয়িম এ সম্পর্কে বলেন : 'আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট মানুষের জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এসব বিধান মানুষের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধানের জন্য তৈরি। যখনই বিভিন্ন মানুষের কাঙ্ক্ষিত সুবিধার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখনই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। ইসলামী বিধান মানুষের উপকার করার জন্য পরিকল্পিত, কিন্তু যখন কোন স্বার্থহানী অনিবার্য হয়ে পড়ে তখন অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্ট সাধনের প্রতি প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মহান আল্লাহর দেয়া বিধানের এই হচ্ছে মৌলিক নীতি যা আল্লাহর বিজ্ঞতা ও উদারতার পরিচায়ক।'[৩৪]

৫. আইনানুগ দখলস্বত্ব : ভূমি দখল আইন সংগত হতে হবে। মহানবী স. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কারও এক বিঘত জমি জোর করে দখল করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার গলায় সাত তবক জমীন বেড়ি রূপে পরিয়ে দিবেন।'[৩৫]

মিথ্যা দলিল ও ভুয়া সাক্ষী প্রমাণের মাধ্যমে কোর্টের রায় নিজের অনুকূলে নেয়ার প্রচেষ্টা তথা দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পত্তি ভোগ দখল করা ইসলামী ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

৬. সুষম ব্যবহার : ব্যক্তি মলিকানা সম্পর্কে শরীয়তের স্পষ্ট নীতি হচ্ছে মালিককে তার ভূমি তথা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে হবে। ব্যক্তি মালিকানা অবশ্যই কুরআনুল করীম ও সুন্নাহ প্রবর্তিত নীতি থেকে যাতে বিচ্যুত না হয় সেজন্য সমাজ তথা রাষ্ট্রকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সম্পদের মালিককে কৃপণ কিংবা অপচয়কারী হওয়া যাবে না। কেননা মহান আল্লাহ উদ্ধত, দাম্ভিক, কৃপণ ও অপচয়কারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। অন্যায়ভাবে অপরিমিত সম্পদের মালিক হওয়া

ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। অমিতব্যয়িতাকে পরিহার করে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ তাঁর রাস্তায় ও মানবতার সেবায় ব্যয় করার জন্য ইসলাম কঠোর তাগিদ দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কৃপণতা ও অপচয় এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা সমর্থন করে।[৩৬]

৭. ভূমি দ্বারা যথার্থ উপকার লাভ : ব্যক্তি মালিকানা সম্পর্কে ইসলামের অন্যতম নীতি হচ্ছে ভূমি তথা সম্পদ মালিকের যথার্থ উপকারে আসতে হবে। লক্ষণীয় যে, বহু ক্ষেত্রে মানুষ তার সম্পদ জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত না করে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতার ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করে। এটা অবশ্যই ইসলামের মৌলিক নীতির বিরোধী। এ বিধানে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, ভূমি কখনো ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। ইসলামী আইন সকল আর্থিক চাপ ও প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রয়াসী। ব্যক্তি মালিকানা সম্পর্কে শর্ত হচ্ছে, ভূমি তথা সম্পদ জীবিত ব্যক্তির স্বার্থে ব্যয়িত হতে হবে। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির কোন ভূমি বা সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ বা ভোগ করার প্রশ্নই আসে না। কাজেই ইসলামী বিধান মোতাবেক মৃত্যুর পর পরই মৃত ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে।[৩৭]

৮. হালাল হারাম বিবেচনা : ভূমি তথা সম্পদ ব্যবহারে হালাল হারামের বিবেচনা করতে হবে। অবৈধভাবে কোন ভূমি কিংবা সম্পদ দখল বা ভোগ করা সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ্ বলেন : 'হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য বস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[৩৮]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, ইসলামে ভূমি মালিকানা তথা ব্যক্তি মালিকানা নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোন ব্যক্তি তার মালিকানাধীন ভূমি বা সম্পদ ইসলামের মৌলিক নীতি বিরোধী কাজে ব্যবহার করলে ইসলামী রাষ্ট্র তার মালিকানা রহিত করার অধিকার রাখে।

মালিকানার অধিকার বিশ্লেষণ

মহান আল্লাহর মালিকানার অধীনে ব্যক্তি মালিকানার অধিকারকে স্বীকার করে নেয়ার জন্য চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। যথা :

১. অপব্যবহার রোধ

২. অন্যায় ব্যবহার রোধ

৩. যথার্থ ব্যবহার

৪. স্থায়ী ব্যবহার।

এই চার ধরনের অধিকার কেবলমাত্র একটি শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ। শর্তটি হচ্ছে, এই সকল অধিকার সমাজের অন্যান্য মানুষের একইরূপ অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না।[৩৯]

১. অপব্যবহার রোধ : বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তুই কোন না কোন উদ্দেশ্যে এবং কোন না কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই কোন কিছু ধ্বংস বা অপব্যবহার করার অধিকার

কারো নেই। ইসলামে অপচয়কে শুধু নিষেধ করা হয়নি, বরং তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।[৪০] কুরআনে বলা হয়েছে : 'কিছুতেই অপব্যয় করো না, যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।'[৪১]

২. অন্যায় ব্যবহার রোধ : অন্যায়ভাবে ভূমি তথা সম্পদ কুক্ষিগত করা ইসলামে নিষিদ্ধ। অন্যায়ভাবে কারো ভূমি আটকিয়ে রাখা বা মজুদদারী ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মজুদদারীতে সম্পদকে কাজে না লাগিয়ে অলস রাখা হয় বলেই একে নিষিদ্ধ বিবেচনা করা হয়েছে। আল্লাহর সম্পদ পুঞ্জিভূত করে অপরকে তা ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। মানুষের সম্পদ ব্যবহার করার সীমিত অধিকার আছে, কিন্তু অন্যায়ভাবে সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার তার নেই।[৪২]

৩. যথার্থ ব্যবহার : ইসলামে যথার্থ ব্যবহারের অধিকার অবাধ নয়, বরং সীমিত। সমাজের কোন শ্রেণীর লোক যদি আশ্রয়হীন থাকে, গৃহহীন অবস্থায় তারা যদি গাছের তলায়, রাস্তায় বা পাহাড়ের গুহায় জীবন কাটায় সে অবস্থায় সম্পদ থাকলেও কেউ তার রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী সৌখিন বাড়ি তৈরি করতে পারে না। ইসলাম তা সমর্থন করে না।[৪৩] ইসলাম চায় ভূমিসহ সকল সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি নাগরিকের বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে। সমাজ মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে সে ক্ষেত্রে কুরআনুল করীম উদ্বৃত্ত সম্পদের উপর ব্যক্তি মালিকদের অধিকার বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেছে। কুরআনুল করীমে এসেছে : 'আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রসূল স.-কে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রসূলের, রসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।'[৪৪]

সাধারণ মানুষের জীবন-মানের উপর ভিত্তি করেই উদ্বৃত্ত ঠিক করা হবে।

৪. স্থায়ী ব্যবহার : ইসলাম সীমাহীন সময়ের জন্য ভূমি তথা সম্পদের ওপর অধিকার স্বীকার করে না। যে মুহূর্তে সম্পদকে অব্যবহৃত রাখা বা সম্পদের অপব্যবহার করা হয় সেই মুহূর্তেই তা বাজেয়াপ্ত যোগ্য হয়ে যায়।[৪৫] ভূমি মালিক নিজে চাষ করতে না পারলে বা না করালে কিংবা নিজে যে পরিমাণ চাষ করতে পারে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ ভূমি থাকলে, তা অন্যের দ্বারা চাষ করাবে। অথবা চাষের কাজে অন্য লোকের সাহায্য গ্রহণ করবে। নিজের ভোগ ও ব্যবহারের প্রয়োজন না হলে, অন্য কথায় কারো প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি থাকলে তা অন্য কোন ভূমিহীনকে চাষাবাদ বা ভোগ করতে দিতে হবে।[৪৬] স্থায়ী ব্যবহারের মূল কথা হল, কুরআনুল করীমে উল্লেখিত এবং মহানবী স.-এর নির্দেশিত পথে ভূমি তথা সম্পদ ব্যবহার করতে হবে।

মালিকানা লাভের বৈধ পন্থা

ইসলামে ভূমি তথা সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা লাভের কয়েকটি বৈধ পন্থা রয়েছে। যেমন :

ক. প্রাকৃতিক উপায় উপাদানের মধ্যে যে সব দ্রব্য ও সম্পদে কারো মালিকানা বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত, প্রথম দখলের মাধ্যমে তাতে দখলকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। মহানবী স. বলেছেন : 'যে ব্যক্তি এমন কোন অনাবাদী জমি আবাদ করবে, যা কারো মালিকানায় নেই, সেই তার মালিক হবে।'[৪৭]

খ. নিজস্ব জ্ঞান বা প্রতিভা কাজে খাটিয়ে কোন জিনিস আবিষ্কার করলে বা কোন যন্ত্র প্রস্তুত করলে, উক্ত জিনিস ব্যবহারে তার স্বত্ব স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হবে।

গ. কোন ব্যক্তির বৈধ পরিশ্রমলব্ধ অর্থ-সম্পদের ওপর তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : 'আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে করে।'[৪৮]

ঘ. উপযুক্ত বিনিময়ে সম্পদ ক্রয়ের মাধ্যমেও ভূমি তথা সম্পদের মালিকানা লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন : 'হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, কিন্তু পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা করা বৈধ।'[৪৯]

ঙ. উত্তরাধিকার সূত্রে কেউ কোন সম্পদ প্রাপ্ত হলে তাতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন : 'পিতা-মাতা, এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে, এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক বা বেশিই হোক, নির্ধারিত অংশ।'[৫০]

চ. রাষ্ট্র বা সরকার কোন নাগরিককে কোন জমি বা সম্পত্তি প্রদান করলে উক্ত ব্যক্তি প্রদত্ত সম্পত্তির মালিক হবে। ইসলামী পদ্ধতিতে একে 'ইকতা'[৫১] পদ্ধতি বলে।

ছ. উপহার-উপঢৌকন, হেবা বা অসীয়তের মাধ্যমেও সম্পদের মালিকানা লাভ করা যায়।[৫২]

মালিকানাবিহীন ভূমি উন্নয়ন ও বন্টন নীতি

ইসলামী অর্থনীতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য নীতি হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকারের দখলে যে সব মালিকবিহীন জমি থাকে, এসব ভূমি ঐ সব ভূমিহীন বা স্বল্প ভূমির মালিক লোকদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে, যারা এসব ভূমি আবাদ ও চাষোপযোগী করে তুলতে এবং তাতে ফসল ফলাতে ইচ্ছুক ও সক্ষম। এই ভূমিসমূহ নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে আবাদ করার শর্তে তাদেরকে দেয়া হবে। তারা যদি এই নির্দিষ্ট মেয়াদ তথা তিন বছর মেয়াদের মধ্যে আবাদ করে, তবে এই জমি তাদের অধিকারেই থাকবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবাদ না করলে তা সরকারের নিকট প্রত্যার্পিত হবে এবং সরকার তা অপর ভূমিহীন জনগণের মধ্যে পুনর্বন্টন করবে। মহানবী স. ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এরূপ ভূমি বন্টনের নিয়ম প্রচলিত ছিল। এ ভূমি বন্টনের ব্যাপারে কিছু জরুরি শর্ত রয়েছে :

ক. সেই জমি কোন নাগরিকের মালিকানাভুক্ত হবে না।

খ. সেই জমি সাধারণ জন-মানুষের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত হবে না। এ ধরনের কোন জমি বিশেষ কোন নাগরিককে ব্যক্তিগতভাবে মালিকানা হিসেবে দান করার সরকারের কোন অধিকার নেই।

গ. এ জমি এমন হবে না যেখানে জন-মানবের জন্য অপরিহার্য কোন ধাতু বা সম্পদের খনি অবস্থিত। এরূপ হলে সেই জমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে দেয়া বৈধ হবে না। এই তিন প্রকার ভূমি ছাড়া অন্য সকল প্রকার ভূমি সরকার যাকে ইচ্ছে বন্টন করে দিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে স্বজন প্রীতি, ঘুষ কিংবা অন্য কোন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না।[৫৩]

ইসলামের আবির্ভাবকালে আরব দেশের ভূমির তিনটি অবস্থা ছিল :

ক. অনেক ভূমি ছিল ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত।

খ. এমন অনেক ভূমি ছিল, যার কেউ মালিক ছিল না।

গ. গৃহপালিত পশুর সাধারণ চারণভূমিরূপে নির্দিষ্ট ছিল অনেক ভূমি।[৫৪]

মহানবী স. মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সর্বপ্রথম মালিকানাবিহীন অনাবাদী জমি আবাদ করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন : যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে যার মালিক নেই, তাহলে সে ব্যক্তিই (ঐ জমির) সবচেয়ে বেশি অধিকারী।'[৫৫] লোকেরা তখন সাধ্যানুসারে জমি আবাদ করার ও মালিক হবার জন্য চেষ্টা করতে লেগে গেল। এভাবে বহু লোকের মধ্যে মালিকানাবিহীন জমি বণ্টন করা হল।

ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক ভূমি বণ্টনের এটাই হল মূলনীতি। অনাবাদী ভূমি আবাদ করা অথবা ভূমিহীন কৃষক বা মুহাজিরদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ হতে কাউকে ভূমি দান করা ইসলামে বৈধ। একে আরবীতে 'ইকতা' বলে। মহানবী স. ইকতারূপে হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত বেলাল, হযরত জুবায়ের রা. প্রমুখ সাহাবীগণকে ভূমি দান করেছিলেন।[৫৬] এভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনও একাধিক ব্যক্তিকে ইকতারূপে ভূমি দান করেছেন। 'কিতাবুল খারাজ'-এ উল্লেখ রয়েছে, 'যদি ইকতার উদ্দেশ্য সাধিত না হয় অথবা যদি অন্যায়রূপে বা অসদুদ্দেশ্যে ইকতা প্রদান করা হয়, তবে এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।'[৫৭] হযরত উমর র. মহানবী স. কর্তৃক প্রদত্ত হযরত বেলাল ইবন হারিস মুযানীর র. ইকতার একাংশ এ জন্যই ফেরত নিয়েছিলেন যে, তিনি এই ভূমি যথাযথভাবে আবাদ করতে সক্ষম হননি। অনুরূপভাবে খলীফা উমর ইবন আবদুল আযীয র. আপন পরিবারের জন্য প্রাপ্ত লাখেরাজ ভূসম্পত্তি এজন্য বাতিল করেছিলেন যে, এগুলো উমাইয়্যা শাসকবর্গ স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে প্রদান করেছিলেন।[৫৮]

উল্লেখ্য যে, সরকারিভাবে যে ভূমি জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হবে এর দ্বারা কোনরূপ সামন্তবাদী বা জায়গীরদারী প্রথা চালু করা যাবে না। যার পক্ষে যে পরিমাণ ভূমি চাষাবাদ, উৎপাদন করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব তাকে ঐ পরিমাণ ভূমিই দেয়া হবে।

সরকারি মালিকানা ছাড়া ক্রয়কৃত ভূমির মালিকগণ যদি বেশিরভাগ আবাদী ভূমি হস্তগত করে বসে এবং গরীব কৃষকের যদি ভূমির প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দেয়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান দু'পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে :

১. মালিকানাবিহীন, পতিত ও অনাবাদি কৃষি ভূমি কৃষকদের মধ্যে বিনা পয়সায় বণ্টন করে দেবেন।

২. ভূমির মালিকদের নিকট কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় ভূমি থাকলে এসব ভূমি তাদের দখলমুক্ত করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন।[৫৯]

মহানবী স.-এর ইন্তিকালের পর প্রথম পর্যায়ে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সংঘর্ষ এবং যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে এই দু'রাষ্ট্রের বিশাল অংশ দখল করে নেয়। ইসলামী রাষ্ট্রের দখলকৃত এই বিশাল ভূমির কেউ মালিক ছিল না। হয় ঐ জমির মালিক যুদ্ধে

নিহত হয়েছে, না হয় তা আসলেই কারো মালিকানাভুক্ত ছিল না বরং পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সরকার প্রদত্ত জমি জায়গা ছিল এবং তা-ই ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে এসেছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফাগণ এই সব জায়গা আবাদ ও ভোগ দখল করার জন্য এমন লোকদের মধ্যে বণ্টন করলেন যারা সেগুলো আবাদ ও ফসল ফলাতে সক্ষম বলে বিবেচিত হয়েছিলেন।[৬০] এ সকল ভূমি বণ্টনে শরীয়তের বিধান পুরোপুরি অনুসৃত হয়েছিল। হযরত উমর রা. গভর্নর হযরত আবূ মুসা আশআরী রা.-কে লিখে পাঠিয়েছিলেন : 'যদি তা জিযয়ার[৬১] জমি না হয় এবং এমন জমিও না হয় যেখানে জিযয়ার জমির জন্য পানি প্রবাহিত হয়, তবে কেবল সেই জমিই সরকারি পর্যায়ে জনগণের মধ্যে বণ্টন করতে পারো।'[৬২] এতে প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র মালিকানা বিহীন জমিই সরকারি পর্যায়ে বণ্টন করা যেতে পারে। আর এইরূপ জমির পূর্ণ বণ্টন সরকারি পর্যায়েই হতে পারে।[৬৩]

সরকারি পর্যায়ে জমি বণ্টনকার্য কেবলমাত্র সেসব জমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ যা সরকারের আয়ত্তাধীন রয়েছে এবং যাতে সরাসরি সরকারি নির্দেশ কার্যকর হতে পারে। কিন্তু যেসব জমির নির্দিষ্ট মালিক রয়েছে সেসব জমি সম্পর্কে সরকার বিনা কারণে কোন নতুন নীতি গ্রহণ করতে পারে না।[৬৪]

সরকারি পর্যায়ে জমি বণ্টনের এটাই মৌলিক বিধান। অতএব সাধারণভাবে ও কোন সামষ্টিক কল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যতীতই খামখেয়ালীভাবে ভূমির মালিকদের উৎখাত করে দিয়ে তা নিজেদের লোকদের মধ্যে অথবা অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যের বিনিময়ে পুনর্বণ্টন করা ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট জুলুম।[৬৫]

সরকারিভাবে যে জমি জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হবে, তার দ্বারা কোনরূপ সামন্তবাদ বা জায়গীরদারী প্রথা রচনা করা চলবে না। যার পক্ষে যত পরিমাণ জমি ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার মধ্যে সামলানো, চাষাবাদ ও ফসল ফলানো সম্ভব হবে বলে বিবেচিত হবে, তাকে ততখানি জমিই দেয়া হবে। অধিক পরিমাণ জমি কাউকেই দেয়া যাবে না। হযরত বেলাল ইবনুল হারিস রা.-কে মহানবী স. প্রচুর জমি নিজে আবাদ করার জন্য দিয়েছিলেন। হযরত উমর ফারুক রা. খলীফা নিযুক্ত হবার পর তাঁকে ডেকে বললেন : মহানবী স. আপনাকে অনেক জমি দিয়েছেন। তার পরিমাণ এত বেশি যে, আপনি তা পুরোমাত্রায় চাষাবাদ করতে পারছেন না। অতঃপর বললেন : 'আপনি বিবেচনা করে দেখুন। যে পরিমাণ জমি আপনি নিজে চাষাবাদ করতে সক্ষম হবেন সে পরিমাণই আপনি নিজের নিকট রাখুন। আর যা সামলাতে পারবেন না কিংবা যে পরিমাণ জমির ব্যবস্থাপনা করা আপনার সাধ্যাতীত, তা আমাদের (রাষ্ট্রের) নিকট ফেরত দিন, আমরা তা অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেব। হযরত বেলাল রা. জমি ফেরত দিতে রাজি না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সাধ্যাতীত পরিমাণ জমি হযরত উমর রা. ফেরত নিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করলেন।[৬৬]

ইমাম আবু ইউসুফ রা. লিখেছেন, 'যে সকল জমি আবাদী নয়, যার কোন মালিক নেই-তা বণ্টন না করে অব্যবহৃত ফেলে রাখা রাষ্ট্রের পক্ষে কিছুতেই উচিত হতে পারে না। কেননা আবাদ করার ফলে যেমন প্রয়োজনীয় খাদ্য ফসল লাভ করা যেতে পারে, তেমনি সরকারের আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে পারে। এ পর্যায়ে হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয রা.-এর একটি আদেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর গভর্নরদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তোমাদের হাতে যে

সব সরকারি জমি জায়গা রয়েছে তা অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে পারস্পরিক চাষের নিয়ম অনুযায়ী জনগণকে চাষ করতে দাও। এতেও যদি তার চাষাবাদ না হয়, তাহলে এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে (তিন ভাগের এক ভাগ পাবে সরকার এবং দু'ভাগ পাবে চাষী) তা চাষ করতে দাও। আর এই শর্তে যদি কেউ জমি চাষ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে দশ ভাগের এক ভাগ ফসল পাওয়ার বিনিময়ে চাষ করতে দিতে পার। এতেও যদি জমি চাষ না হয় তাহলে কোনরূপ বিনিময় না নিয়ে এমনিই চাষ করতে দাও। এভাবেও কেউ চাষ করতে না চাইলে তার চাষাবাদ করার জন্য বাইতুলমাল[৬৭] হতে অর্থ ব্যয় কর এবং কোন জমিই তোমরা অব্যবহৃত থাকতে দিবে না।[৬৮]

ইসলামে ভূমির প্রকারভেদ

ইসলামের ভূমি নীতি একটি বিশ্বজনীন ব্যবস্থা। ইসলামের ভূমি ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের ভূমির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। যেমন :

ক. ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি : ইসলাম বৈধ পন্থায় ক্রয়কৃত কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিকে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি বলে স্বীকার করে।

খ. সরকারি মালিকানাধীন ভূমি : দেশের সকল ভূমি ব্যক্তি মালিকানায় সমর্পণ না করে রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে রাখার অনুমতি রয়েছে। যাতে প্রয়োজনের সময় দেশের সার্বিক কল্যাণ ও ভূমিহীন লোকদের মধ্যে তা বণ্টন করা সম্ভব হয়। সরকারি মালিকানাধীন ভূমির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

১. মালিকানাবিহীন যে সকল ভূমি গ্রাম ও শহরবাসীদের সাধারণ ও যৌথ প্রয়োজনের খাতিরে ব্যবহৃত হয়। যথা- খাল, বিল, নদী, ঝরণা, গোচারণ ভূমি, সড়ক, পথঘাট, খেলার মাঠ, কবরস্থান ইত্যাদি। এছাড়া বন, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ ভূমিও সরকারি মালিকানায় থাকবে।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে পরাজিত বিধর্মীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ভূ-সম্পত্তি সরকার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে এ প্রকার ভূসম্পত্তি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যেও বণ্টন করতে পারেন। মহানবী স. খায়বরের বিজিত ভূমির অর্ধেক বণ্টন করে বাকি অর্ধেক রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গ্রহণ করেন। অবশ্য সরকার ইচ্ছে করলে উক্ত ভূমি খাজনা লাভের বিনিময়ে তা পূর্বতন মালিকদেরও দিতে পারেন।

৩. শত্রুদের ছেড়ে যাওয়া পরিত্যক্ত ভূ-সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত হবে। ইহুদী বনু নযীর গোত্রের ভূমি সরকারি মালিকানাধীন হয়েছিল।

৪. মালিকানাবিহীন যে সকল ভূমি পতিত অবস্থায় থাকে এবং শহর বা গ্রামের মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় না। যেমন বন-জঙ্গল, মরুভূমি, অনাবাদী পাহাড়ী জমি ইত্যাদি। এসব জমি কার্যত যেমন আবাদ ও ফসলযোগ্য নয়, তেমনি এর দ্বারা কোন উপকারও হয় না। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় এ শ্রেণীর ভূমিকে 'আরদে মাওয়াত' বলা হয়। এ শ্রেণীর ভূমির মালিক হয় সরকার।

৫. যে ভূমির মালিকের মৃত্যু হয়েছে এবং তার কোনও উত্তরাধিকারও নেই এমন ভূমিকে 'আদিউল আরদ' বলা হয়। এরূপ ভূমির মালিক হবে স্বয়ং সরকার।

৬. বিজিত অঞ্চলের ভূমি 'খালিসা' বা খাস জমি হিসাবে পরিগণিত হয় এবং এর মালিকানার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। যেমন হযরত উমর রা. কর্তৃক পারস্য বিজিত হলে তিনি সেখানকার সম্রাটের ও তার পরিবারের অধিকারভুক্ত ভূমিকে 'খালিসা' হিসেবে গ্রহণ করেন।

৭. কোন ভূমির মালিক স্বেচ্ছায় মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ করে রাষ্ট্রের অধীনে ছেড়ে দিলে তা রাষ্ট্রের হয়ে যায়। যেমন, মদীনা রাষ্ট্র গঠিত হলে চাষাবাদে অতীব কষ্টকর এমন সব শুষ্ক অনুর্বর জমি আনসারগণ মহানবী স.-এর হাতে তুলে দেন। তাঁকে ইচ্ছেমত এগুলো ব্যবহারের অধিকার দেয়া হয়।

৮. সাধারণত আবাদী ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাই চূড়ান্তভাবে বিদ্যমান থাকে। মালিক তার ইচ্ছেমত এগুলোতে চাষাবাদ ও অন্যান্য উৎপাদনমূলক কাজ করতে পারে। মালিকের বৈধ অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ এ ধরনের ভূমিতে হাত দিতে পারে না। ব্যক্তির মালিকানায় এরূপ উৎপাদনশীল ভূমি কী পরিমাণ থাকতে পারবে তার সীমারেখা ইসলাম বেঁধে দেয়নি। কিন্তু কোন ব্যক্তির হাতে সাধ্যাতীত পরিমাণ ভূমি থাকলে অর্থাৎ তার মালিকানাধীন ভূমিতে চাষাবাদ করার ক্ষমতা না থাকলে এবং এর ফলে তার ঐ ভূমি একটানা তিন বছর অনাবাদী পড়ে থাকলে রাষ্ট্র ঐ ভূমির মালিকানার দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করে ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিতরণ করতে পারবে এবং অনেক ক্ষেত্রে বর্গাচাষেও দিয়ে দিতে পারবে। যদিও বর্গাচাষের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত রয়েছে।

৯. এমন সব উর্বর ও উৎপাদনশীল ভূমি আছে যেগুলো চাষাবাদ না করার কারণে অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকে। এরূপ ভূমি যদি কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাষাবাদ করে তবে সে ঐ ভূমির মালিক হয়ে যাবে। অবশ্য এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুমতির প্রয়োজন আছে। এরূপ ভূমির চাষাবাদকারী ব্যক্তিকে সরকার ভূমিস্বত্ব প্রদান করতে পারে। এ স্বত্ব তারা বংশ পরম্পরায় ভোগ করার অধিকার রাখে। এ প্রকারের ভূমির মাধ্যমে 'আরদে মাওয়াত' নামীয় মালিকানাবিহীন ভূমিও রয়েছে। উৎপাদনের স্বার্থে এসব ভূমি সরকার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চাষাবাদের জন্য ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করতে পারে।

১০. সরকারি মালিকানাধীন পশু বিচরণের জন্য সংরক্ষিত ভূমি সরকারি ভূমি হিসাবেই বিবেচিত হবে।

১১. প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বনভূমি মানুষের কাছে মহান আল্লাহর দান স্বরূপ। এখান থেকে মানুষ বহুমুখী উপকার লাভ করে। এ ধরনের বনাঞ্চল অবশ্যই সরকারি মালিকানাধীন থাকবে। তবে বনাঞ্চল সংরক্ষণ, পরিচর্যা সর্বোপরি সম্পদ সংগ্রহের বিধি-বিধান তৈরি করে কিছু শর্ত সাপেক্ষে এ ধরনের ভূমি কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সংগঠনকে ইজারা দেয়া যেতে পারে।

১২. খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ ভূমি কোনভাবেই ব্যক্তি মালিকানায় থাকতে পারে না। কারণ এর সাথে দেশের জনস্বার্থ সংযুক্ত। এ প্রকারের ভূমি কোন এক ব্যক্তিকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করেও মহানবী স. সর্বসাধারণের উপকারের কথা চিন্তা করে আবার তা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে ফিরিয়ে নিয়ে নজীর সৃষ্টি করেছেন।

১৩. মরু ও পাহাড়ী ভূমির উৎপাদনের ক্ষমতা নেই বলে ব্যক্তিবিশেষের কাছে এর তেমন ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকে না। এ জাতীয় ভূমিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে রাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে কোন ব্যক্তি এ প্রকারের ভূমির মালিকানা লাভ করতে পারে।[৬৯]

অমুসলিমদের অধিকারভুক্ত ভূমির অবস্থা

১. মুসলমানদের নিকট যুদ্ধে অমুসলিম বাসিন্দারা পরাজিত হলে অথবা চুক্তি ভঙ্গ করার পর মুসলমানগণ বলপ্রয়োগ করে তাদেরকে পরাভূত করলে, তারা 'যিম্মী' হিসেবে গণ্য হবে। তাদের ধন-সম্পদ এবং জায়গা-জমি গনীমতের মালরূপে পরিগণিত হবে এবং এর বিলি ব্যবস্থা, চাষাবাদ ও বন্দোবস্তের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে তা যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে। ইচ্ছে করলে শর্তসাপেক্ষে চাষাবাদের জন্য পূর্বের চাষীদের মধ্যেও বণ্টন করে দিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তারা আর মালিকানা ফেরত পাবে না। বস্তুত মহানবী স. খায়বরের[৭০] ইয়াহুদীদের সাথে এই নীতিই প্রয়োগ করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, মহানবী স. উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেক ভাগের শর্তে খায়বরের জমি (ইহুদীদেরকে) বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।'[৭১]

২. স্বেচ্ছায় যে সব অমুসলিম জাতি ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি করবে, ইসলামী রাষ্ট্র চুক্তি অনুসারে তাদের সকল অধিকার রক্ষা করবে। তারাই তাদের জায়গা-জমি ভোগ-দখল করবে। চুক্তি অনুসারে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের দেয় কর আদায় করতে থাকবে। খায়বর বিজয়ের পর ফাদাক নামক স্থানের অধিবাসীগণ মহানবী স.-এর সাথে সন্ধি করার জন্য নিজেদের পক্ষ থেকে উদ্যোগী হয়েছিল এবং তাদের জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ইসলামী রাষ্ট্রকে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। মহানবী স. তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। ফাদাকের জমি বণ্টিত না হয়ে এর অধিবাসীদের হাতেই রেখে দেয়া হয়েছিল।[৭২]

৩. যে সব অমুসলিম ভূমি মালিক মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হয় কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র হতে পালিয়ে অন্যত্র চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এর মালিক বা উত্তরাধিকারী কেউই অবশিষ্ট থাকে না। এসব জায়গা জমি বিজয়ী মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র তা জনগণের মধ্যে পুনর্বণ্টন করবে। হযরত উমর রা. এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেন, 'যে সমস্ত জমি পারস্যের সম্রাটগণ তাদের বংশধর কিংবা যুদ্ধে নিহত অথবা পালিয়ে দেশ ত্যাগকারী লোকদের মালিকানাভুক্ত করে দিয়েছিল, হযরত উমর রা.-এর সবই রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত করে নিয়েছিলেন।'[৭৩]

মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ কল্যাণকর ও সর্বজনীন। এতে জুলুম বা শোষণের কোন অবকাশ নেই। সর্বোপরি ইসলামী অর্থনীতিতে মালিকানা নীতি একটি সুষম ও আদর্শিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যবস্থায় যেমন সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়, তেমনি ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নীতির মত যথাক্রমে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা প্রদান করে সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার দেয়া হয় না। মোটকথা ইসলামী আইনে ভূমিসহ যাবতীয় সম্পদের মৌলিক মালিকানা আল্লাহর এবং তার নির্দেশিত পন্থায় ভোগ ও ব্যবহারের শর্তে ব্যক্তি মালিকানাও স্বীকৃত।[৭৪]

তথ্যপঞ্জি

১. সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৯৮, পৃ. ৪৩৯।
২. ড. এফ. এম মনিরুজ্জামান, বিপন্ন পরিবেশ ও বাংলাদেশ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা : ১৯৯৭, পৃ. ৪৫।

৩. ড. মোঃময়নুল হক, ইসলাম : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৩, পৃ. ৮৩।
৪. আল-কুরআন, ৫৫:৩৩।
৫. আল-কুরআন, ১১:৬১।
৬. আল-কুরআন, ২:২২।
৭. আল-কুরআন, ২:৬১।
৮. আল-কুরআন, ২০:৫৫।
৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, ঢাকা : রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি, পৃ. ৩১৪।
১০. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন সাওরাহ, জামে আত তিরমিযী, ১ম খণ্ড, দিল্লী : মাকতাবাহ রশীদিয়্যাহ, তা.বি., পৃ. ২৫৬।
১১. 'পুঁজিবাদ'– পুঁজিবাদ বলতে বোঝায় প্রত্যেক ব্যক্তি একাই তার স্বোপার্জিত সম্পদের মালিক। তার উপার্জিত সম্পদে কারো কানাকড়িও অধিকার নেই। নিজের সম্পদ সে ইচ্ছেমত ব্যয় করতে পারে। অর্থ উপার্জনের যেসব উপায় উপকরণ তার আয়ত্তাধীন থাকে সেগুলো কুক্ষিগত করে রাখার এবং কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার না করে সে সব ব্যবহার করতে অস্বীকার করার ও অধিকারও তার আছে। প্রত্যেক মানুষের যে স্বাভাবিক স্বার্থপরতা রয়েছে তা থেকেই পুঁজিবাদের জন্ম। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, বাংলা অনু. আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ১-৩)।
১২. 'সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা'–পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অর্থব্যবস্থা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এ অর্থ ব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে : অর্থ উৎপাদনের যাবতীয় উপায় উপকরণ সমাজের সম্মিলিত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। কোন বস্তুকে ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত করে নিজের ইচ্ছেমতো তা ব্যবহার করার ও তা থেকে ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা অর্জন করার অধিকার কারো নেই। সমাজের সম্মিলিত স্বার্থে ব্যক্তি যেসব কাজ করবে কেবল সে কাজগুলোরই সে পারিশ্রমিক পাবে। তার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সরবরাহ করার দায়িত্ব সমাজ গ্রহণ করবে এবং তার বিনিময়ে তাকে সমাজের নির্দেশ মতো কাজ করে যেতে হবে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৬)।
১৩. আল-কুরআন, ২:২৮৪।
১৪. আল-কুরআন, ১৪:২।
১৫. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-৪০।
১৬. শামছুল আলম, 'আল্লাহর মালিকানা', ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা : অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৬৬, পৃ. ১৯৮।
১৭. আহমদ আখতার ফারুক, সম্পদের মালিকানা : ইসলামের আলোকে, দৈনিক ইনকিলাব, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩।
১৮. অধ্যক্ষ আবুল কাসেম, কুরানিক অর্থনীতি, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ. ৯-১০।
১৯. ড. এম. এ. মান্নান, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৬।
২০. আল-কুরআন, ৪:২।
২১. আল-কুরআন, ৪:৩২।
২২. আল-কুরআন, ৪:৩৩।
২৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, দিল্লী : মাকতাবাহ রশীদিয়্যাহ, তা.বি., পৃ. ৩২।
২৪. ইয়াহইয়া ইবন আদম, কিতাবুল খারাজ, বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ, ১৪০০/১৯৭৯, পৃ. ৯৩।
২৫. আল-কুরআন, ২:২৬১-৬২।
২৬. আল-কুরআন, ২:২৭১।
২৭. নিসাব : কোন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর কমপক্ষে যে পরিমাণ সম্পদ তার মালিকানায় বিদ্যমান থাকলে তার ওপর যাকাত প্রদান ফরয হয়, ইসলামী পরিভাষায় তাকে নিসাব বলে। বিভিন্ন সম্পদের নিসাব বিভিন্ন হারে হয়ে থাকে। যেমন, রৌপ্যের বায়ান্ন তোলা, স্বর্ণের নিসাব সাড়ে সাত তোলা এবং নগদ অর্থের নিসাব সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা বায়ান্ন তোলা রূপার বাজার দরের সমপরিমাণ। উক্ত সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদেয়। যাকাত নগদ অর্থ দ্বারাও পরিশোধ করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদ দ্বারাও পরিশোধ করা যায়। বছরের শুরুতে ও শেষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা জরুরী। মাঝখানে কোন সময় তা বিদ্যমান না থাকলেও যাকাত ওয়াজিব হবে। মুহাম্মদ মূসা, 'যাকাত', ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২১শ খ., ১৯৯৬, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮)।

২৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, (অনু : আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান), ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ১৮-১৯।

২৯. উশর বলা হয় যাকাতের ন্যায় একটি নির্ধারিত অংশকে; যা জমির ফসলের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে ধার্য করা হয় এবং ফসল থেকেই তা গ্রহণ করা হয়। যদি উক্ত আবাদী জমিতে পুকুর থেকে পানি সেচ করা হয় কিংবা নদী ও সাগর বাহিত হয়, অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারাই যদি উক্ত জমিতে ফসল উৎপাদন করা হয় তাহলে এ জাতীয় আবাদী জমিতে উৎপাদিত ফসলের দশভাগের এক ভাগ কর হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আর যদি কূপ খনন করে পানিতে সেচের মাধ্যমে উক্ত জমিতে ফসল উৎপাদন করা হয় তাহলে ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করা হয়।

৩০. খারাজ বা খাজনা হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক অমুসলিম প্রজাদের উপর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া হেতু জমিনের উৎপাদিকা শক্তির সংশ্লিষ্ট কর। অর্থাৎ খারাজ কৃষিজ জমির উপর আরোপিত হয়ে থাকে। মূলত অমুসলিম প্রজারা শান্তি-শৃংখলা এবং শত্রু আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা ভোগ করার জন্যে মুসলিম রাষ্ট্রকে যে খাজনা দিয়ে থাকে তাই 'খারাজ।'

৩১. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, 'ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ওশর : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর একটি প্রয়োগিক পর্যালোচনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ৬৮-৬৯।

৩২. আল-কুরআন, ২:২৬৭।

৩৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৩৪. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর, মিফতাহু দারিস-সাআদা, কায়রো : মাকতাবা উবাইদুল্লাহ কুর্দী, ১৪১৫, ১৯৯৪, পৃ. ৩৫৯।

৩৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৩৬. ড. এম. এ. মান্নান, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-২২।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

৩৮. আল-কুরআন, ২:১৬৮।

৩৯. অধ্যাপক এম.এ. সামাদ, ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬।

৪০. প্রাগুক্ত পৃ. ১৫-১।

৪১. আল-কুরআন, ১৭:২৬-২৭।

৪২. অধ্যাপক এম.এ. সামাদ, ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৪৪. আল-কুরআন, ৫৯:৭।

৪৫. অধ্যাপক এম.এ. সামাদ, ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৪৬. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

৪৭. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪।

৪৮. আল-কুরআন, ৫৩:৩৯।

৪৯. আল-কুরআন, ৪:২৯।

৫০. আল-কুরআন, ৪:৭।

৫১. 'ইকতা'-ইকতা ইসলামী ফিকহ-এর একটি পরিভাষা। সরকার কর্তৃক কোন মালিকানাবিহীন ভূমি চাষাবাদের জন্য কউকে প্রদান করা হলে এমতাবস্থায় যাকে সেই ভূমি প্রদান করা হয়, সে যতদিন পর্যন্ত তার খারাজ বা উশর দিতে থাকবে ততদিন মালিকের ন্যায়ই উক্ত ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার করার অধিকার থাকবে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'ইকতা', সায়্যিদ নাযীর নিযামী/ আবদুল জলীল, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ২৯৪)।

৫২. আহমদ আখতার ফারুক, সম্পদের মালিকানা : ইসলামের আলোকে, দৈনিক ইনকিলাব, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩।

৫৩. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

৫৪. বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবু বাকার আল-ফারগানী আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী : কুতুবখানা রহীমিয়্যা, তা.বি., পৃ. ৪৬২।

৫৫. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪।

৫৬. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, বৈরুত : দারুল মায়ারিফাহ, তা.বি., পৃ. ৬১।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

৫৮. আবূ উবাইদ আল-কাসেম ইবন সাল্লাম, কিতাবুল আমওয়াল, ইসলামাবাদ : ইদারাহ তাহকিকাতে ইসলামী, ১৪০৭/১৯৮৬, পৃ. ১২৬।
৫৯. মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, (অনু : মওলানা আবদুল আউয়াল), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ১৯২।
৬০. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-৫৬।
৬১. 'জিযয়া' শব্দটির বহুবচন জিযা; জাযা' শব্দ হতে উৎপন্ন। অর্থ কর, মাথা পিছু ধার্য কর, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের ওপর ধার্যকৃত কর। আল্লামা যামাখশারীর মতে, যিম্মীগণ এই কর প্রদান করে নাগরিক হিসাবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি অংশ হতে অব্যাহতি লাভ করে বলে এর নাম জিযয়া। (মুহাম্মদ ইবন উমর আব যামাখশারী, আল-কাশশাফ আন হাকাইকিত তানযীল ওয়া'উয়ূনি আকাবীল, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি., পৃ. ২৬২)।
৬২. আবূ উবাইদ আল-কাসেম ইবন সাল্লাম, কিতাবুল আমওয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪।
৬৩. প্রাগুক্ত পৃ. ৪৮৮।
৬৪. আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ আল-মাওয়ার্দী, আহকামুস সুলতানিয়া-আল উলায়াতুদ দীনিয়্যা ফী আকামিস সুলতানিয়্যা, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৩৯৯/১৯৭৮, পৃ. ১৬৮।
৬৫. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।
৬৬. ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
৬৭. 'বাইতুলমাল'-বাইতুলমাল অর্থ ধনাগার, কোষাগার, মাল বা ধনদৌলতের ঘর। ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের ট্রেজারী বা কোষাগারকে বাইতুলমাল বলা হয়। মহানবী স.-এর যুগ থেকেই কোন না কোন রূপে বাইতুল মালের অস্তিত্ব ছিল। হযরত আবূ বকর রা.-এর খিলাফতকালেও অনুরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। হযত উমর রা.-এর খিলাফতের যুগেই পরিপূর্ণরূপে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাইতুলমাল অস্তিত্ব লাভ করে। ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় রাজস্ব বাইতুলমালের সম্পত্তি। সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর আওতাভুক্ত অর্থই বাইতুলমালের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। ইমাম অথবা তাঁর প্রতিনিধি উক্ত সম্পত্তিকে মুসলিম উম্মাহর যে কোন কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে পারেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মু. মাজহারুল হক 'বাইতুল-মাল', ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫শ খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃ. ৫৯৪-৬০৭)।
৬৮. ইমাম আবূ উবাইদ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম, কিতাবুল আমওয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩।
৬৯. মোঃ আবু তাহের, ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং, ঢাকা : তামান্না পাবলিকেশন্স, ২০০৬, পৃ. ২১০-২১২।
৭০. বস্তুত ইসলামের ভূমিনীতি নির্ধারণের ব্যাপারে খায়বরের ঘটনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ৭ম হিজরী সনে খায়বরবাসীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। মহানবী স. খায়বরের সমস্ত জমি ও খেজুর গাছ এই শর্তে বন্দোবস্ত দেন যে, তারা এর অর্ধেক ফলন বা ফসল প্রদান করবে। (বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবু বাকার আল ফারগানী আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, দেওবন্দ : কুতুবখানা রহীমিয়্যা, তা.বি., পৃ. ৪০৮)।
৭১. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩।
৭২. ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
৭৩. প্রাগুক্ত।
৭৪. প্রাগুক্ত।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১২, পৃষ্ঠা : ৭৩-৭৮

ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান

মো. নূরুল আমিন

। সাত ।

ইসলামে পানি আইন সংকলন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে উসমানীয় শাসনামলে গৃহীত দেওয়ানী বিধি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমরা কিছুটা আলোকপাত করেছি। মিজিলি বিধিমালা নামে পরিচিত (Mejeele Qttoman civil code) এই আইনটি ১৮৭০ এর দশকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক পানি আইনে পরিণত হয়েছিল। এতে পানির সংগা ও শ্রেণী বিভাগ, মালিকানা ও ব্যবহার বিধি, পানি স্বত্বের বিক্রয় ও হস্তান্তর, নদী পথের সংরক্ষণ হারিম এলাকা নির্ধারণ প্রভৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সাম্রাজ্যের অংগ ছিল এমন অনেক মুসলিম দেশে এই আইনের প্রচলন এখনো পরিলক্ষিত হয়।

নদীপথ সংরক্ষণ

মিজিলি আইনের ১৩২১ থেকে ১৩২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উসমানীয় শাসনাধীন মুসলিম দেশসমূহে নদী পথ সংরক্ষণ কাজ পরিচালিত হতো। এক্ষেত্রে সরকারি মালিকানাধীন নদ-নদীসমূহের সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল সরকারের। তবে সরকারি কোষাগারে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে নদী সংরক্ষণের ব্যয়ভার সাধারণ মানুষ বিশেষ করে সন্নিহিত এলাকায় উপকারভোগীদেরও বহন করতে হতো (অনুচ্ছেদ ১৩২১)। পক্ষান্তরে এই আইনের ১৩২২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি মালিকানাধীন নদী নালা বা জলাশয় সংস্কার ও সংরক্ষণের দায়িত্ব ঐসব মালিকদের ওপর বর্তায় যারা সংশ্লিষ্ট নদী ও জলাশয় থেকে পানি নিয়ে জমিতে সেচ দেন অথবা গৃহপালিত পশুর গোসলের কাজে ব্যবহার করেন। যারা এই পানি শুধু খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করেন এই আইন অনুযায়ী সংরক্ষণ ব্যয় তারা দিতে বাধ্য নন। সরকারি মালিকানাধীন নদী পথের বেলায় পানি স্বত্বের অধিকারী সকল ব্যক্তি যৌথভাবে তার মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য দায়ী; বেসরকারি মালিকানাধীন জলাশয়ের ক্ষেত্রে যদি কোনও শরীক এই ব্যয় বহন না করেন অথবা করতে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে যারা নিজেদের অর্থ ব্যয়ে সংস্কার ও সংরক্ষণ কাজ করেছেন তারা আনুপাতিক অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শরীকদের অধিকার প্রয়োগে বাধা দিতে পারবেন।

লেখক : সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং গবেষক।

এখানে সমানধিকার সম্পন্ন যৌথ মালিকানাধীন জলাশয়ের মেরামত ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুকদের মধ্যে একটি ব্যবধান টানা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৩২৩)।
যদি সেচাধিকার প্রাপ্ত, যৌথ মালিকানাধীন জলাশয় ও নদী পথের সকল অংশীদারই সংরক্ষণ কাজে শরিক হতে অস্বীকার করে তাহলে সরকারি নৌপথের বেলায় সরকার তাদের এ কাজ করতে বাধ্য করতে পারেন, কিন্তু বেসরকারি নৌপথের বেলায় এই বাধ্য বাধকতা প্রযোজ্য নয় (অনুচ্ছেদ ১৩২৪)।
জলাশয় ও স্রোতস্বীনীর বেলায় মেরামত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব উজান থেকে শুরু হয় এবং এর প্রাথমিক ব্যয় সকলকেই বহন করতে হয়। উজানের সুবিধাভোগীরা যদি তাদের অংশের সংরক্ষণ ব্যয় পরিশোধ করে দেয় তাহলে ভাটি এলাকার ব্যয় বহন করতে তারা বাধ্য নন। এখানে নীতিটি হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক সুবিধাভোগী তারা প্রাপ্ত সুবিধার আনুপাতিক হারে মেরামত ব্যয় বহন করবেন (অনুচ্ছেদ ১৩২৬)।

হারিম বা নিষিদ্ধ এলাকা

মিজিলি আইনের ১২৮১ থেকে ১২৯১ নং অনুচ্ছেদে হারিম বা নিষিদ্ধ এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এতে হারিমকে নিম্নোক্তভাবে সংগায়িত করা হয়েছে :
হারিম হচ্ছে একটি কুয়ার চারদিকে ৪০ হাত বা ৪০ আরশুনের সমপরিমাণ সংরক্ষিত এলাকা যেখানে কারুর অনধিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ (অনুচ্ছেদ ১২৮১)।
ঝরনার বেলায় হারিমের পরিমাণ হচ্ছে ৫০০ আরশুন। তবে এক্ষেত্রে পানি একক উৎস সম্পন্ন হতে হবে এবং তা সমতল ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২৮২)।
যে সব নদীর মেরামত ও সংস্কারের খুব একটা প্রয়োজন হয় না সেসব নদীর হারিম হচ্ছে উভয় তীরে তার প্রস্থের অর্ধেকের সমপরিমাণ স্থান (অনুচ্ছেদ ১২৮৩)।
আবার ছোটখাট নদী যেগুলোর নিয়মিত মেরামত ও সংরক্ষণ প্রয়োজন সেগুলোর হারিম বা সংরক্ষিত এলাকা অথবা নিষিদ্ধ এলাকার পরিমাণ হচ্ছে উভয় তীরের ততটুকু প্রশস্ততা যতটুকু তা পুনঃখনন, পাড় তৈরি অথবা তাতে ইট বা পাথর বসানোর জন্য প্রয়োজন। খাল, নালা, পানির পাইপ অথবা ভূগর্ভস্থ পানি প্রবাহের বেলায়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য (অনুচ্ছেদ ১৮৮৪)।
ভূগর্ভস্থ পানি যদি উপরিস্থ সমতল ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে ঝরনার ন্যায় তার হারিম ও উভয় তীরের ৫০০ আরশুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ (অনুচ্ছেদ ১২৮৫)।
কুয়ার হারিম তার মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (অনুচ্ছেদ ১২৫), অন্য কোনও ব্যক্তি কখনো এর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। যদি কোনও ব্যক্তি অন্যের হারিমে কোনও কুয়া খনন করে তাহলে হারিমের মালিক তা বন্ধ করে দিতে পারেন, ঝরনা, নদী এবং খাল বিলের হারিমের বেলায়ও একই আইন প্রযোজ্য (অনুচ্ছেদ ১২৮৬)।

যদি সুলতানের অনুমতি নিয়ে একটি কুয়ার পাশে আরেকটি কুয়া খনন করা হয় তাহলে নতুন কুয়ার হারিম হবে পুরাতন কুয়ার দিক ছাড়া আর সব দিকে ৪০ আরশুন। পুরাতন কুয়ার সংরক্ষিত এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ১২৮৭)।
যদি কোনও পুরাতন কুয়ার হারিম এলাকার বাইরে আরেকটি কুয়া খনন করা হয় এবং পুরাতন কুয়ার পানি কুয়ায় এসে পড়ে তাহলে আইনের দৃষ্টিতে কিছুই করণীয় নেই। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যদি কোনও পুরাতন দোকানের পাশে নতুন দোকান খোলা হয় এর ফলে পুরাতন দোকানের বেচা বিক্রি হ্রাস পায় তাহলে নতুন দোকান বন্ধ করা যায় না (অনুচ্ছেদ ১২৮৮)।
অন্যের জমি বরাবর প্রবাহিত কোনও নলের যদি পাড় খনন করা হয় তাহলে পানির লেভেল পর্যন্ত তার মালিকানা নালা মালিকের ওপর বর্তায়, তিনি যদি নালার উভয় পাড় উঁচু করেন তাহলে উঁচুকৃত পাড়েরও তিনি মালিক হবেন। যদি পাড় উঁচু করা না হয় এবং এমন কোনও প্রমাণ না থাকে যে জমির মালিক অথবা চ্যানেলের মালিক কেউই পাড়ের দখল নেননি অথবা তাতে গাছপালা লাগাননি তাহলে পাড়ের যে অংশ পানির স্তরের উপরে থাকবে তার মালিক হবেন জমির মালিক। চ্যানেল বা নালার মালিক যখন তার সংস্কার করবেন তখন তিনি উভয় পাড়ের ওপর মাটি ফেলতে পারবেন। এই অধিকার তার রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১২৯০)।
যে কেউ তার নিজের মালিকানাধীন জমির ওপর কুয়া খনন করলে ঐ কুয়ার নির্দিষ্ট কোনও হারিম থাকবে না (অনুচ্ছেদ ১২৫)। একজন প্রতিবেশী ঐ কুয়ার পাশে তার নিজের জমিতে আরেকটি কুয়া খনন করতে চাইলে তিনি তা করতে পারেন। এক্ষেত্রে পুরাতন কুয়ার মালিক তাকে বাধা দিতে পারেন না। তিনি বলতে পারেন না যে আমার কুয়ার পানি নতুন কুয়ায় চলে যাচ্ছে (অনুচ্ছেদ ১২৯১)।

পানি আইনের আধুনিক ধারা প্রবণতা

আমরা আগেই বলেছি যে উসমানীয় খেলাফতের অধীন সকল দেশের পানি আইনই মিজিলি কোড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণে দেখা যায় যে ১৯১১ সাল পর্যন্ত লিবিয়া এবং ১৯২২ সাল পর্যন্ত সোমালিয়া, সউদী আরব, জর্দান, ইরাক, ইরান, সিরিয়া, লেবানন এবং তুরস্ক এই আইন অনুসরণ করছে। এছাড়াও এই খেলাফতের বাইরে বেশ কিছু মুসলিম দেশও তাদের পানি আইনের ভিত্তি হিসেবে মিজিলি কোডকে গ্রহণ করেছিল বলে জানা যায়। ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকরাও কম বেশি এই আইন অনুসরণ করেছে। আশির দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশে Ground water rules জারি করা পর্যন্ত Convention হিসেবে এ অঞ্চলে মিজিলি কোডের অংশ বিশেষ অনুসরণ করা হতো। ১৯২৬ সালে তুরস্ক সেক্যুলার রিপাবলিকে রূপান্তরিত হবার পর মিজিলি কোড পরিত্যাগ করে একটি নতুন দেওয়ানী আইন জারি করে যা এখনো বহাল আছে। বলা বাহুল্য, সেচ কূপ স্থাপনে বাংলাদেশে বর্তমানে যে জোনিং (Zoning) বিধি অনুসরণ করা হয় তাতে একটি গভীর নলকূপ থেকে আরেকটি গভীর নলকূপের দূরত্ব ২৫০০ ফুট, একটি গভীর

নকলূপ থেকে আরেকটি অগভীর নলকূপের দূরত্ব ১৭৫০ ফুট এবং একটি অগভীর নলকূপ থেকে আরেকটি অগভীর নলকূপের দূরত্ব ৮০০ ফুট নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অন্য কোন নলকূপ খনন করা যাবে না। এটা হচ্ছে নিষিদ্ধ এলাকা যা ইসলামী আইনে হারিম হিসাবে পরিচিত। নলকূপ স্থাপনে overlappus এর ফলে যাতে কোনও নলকূপে পানি উত্তোলন ব্যাহত না হয় এবং উপকারভোগীদের গৃহস্থালী ও কৃষি কাজে ব্যবহার্য পানি সরবরাহে ঘাটতি দেখা না দেয় এজন্যই এই হারিমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে কোন কোন অঞ্চল ও দেশ ফরাসী ও বৃটিশ ম্যান্ডেটে ন্যাস্ত হলেও যেমন সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, ট্রান্স জর্দান এবং ফিলিস্তিন) মিজিলি কোডের প্রয়োগ অব্যাহত ছিল এবং পরবর্তীকালে তাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে অন্তত আংশিক হলেও আজো অব্যাহত রয়েছে। অবশ্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এসব দেশে পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ কিছু আইনও প্রণয়ন করা হয়েছিল। এসব আইনে মিজিলি কোডকে যেমন স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তেমনি শরিয়াহর নীতিমালাও স্থানীয় রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাও প্রকাশ করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে পানিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ঘোষণা করে খাবার, গৃহস্থালী ব্যবহার ও পশু গোসল করানো ছাড়া অপরাপর নতুন ব্যবহারের জন্য পারমিট প্রথার প্রবর্তন করা হয়। এই আইন বলে পানির বিভিন্ন স্বত্ব ও নিবন্ধনের জন্য কমিশনও গঠন করা হয়।

উপরোক্ত অঞ্চলগুলো বর্তমানে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিভিন্ন নামে পরিচিত। এদের মধ্যে কোন কোন দেশ বিশেষ করে জর্দান ও ইরাকে মিজিলি কোড ছাড়াও ট্রাস্টিশীপের অধীনে কিছু কিছু পানি আইন ও বিধি বিধান জারি করা হয়েছে। এছাড়া তারা নতুন কিছু আইনও প্রণয়ন করেছে। এই আইনসমূহে পানির সরকারি মালিকানা এবং পানির বিদ্যমান স্বত্বসমূহ যথাযথ পরীক্ষা সাপেক্ষে বিশেষ কমিটির অধীনে নিবন্ধের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে সউদী আরব ইয়েমেন ও ওমান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর বিশেষ করে সউদী আরব মিজিলি কোড প্রত্যাখ্যান ও বাতিল করে শরিয়াহর পবিত্র নীতিমালা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এই দেশগুলোতে Madina Customary Law-এর নীতিমালা পরিবর্তনের জন্য নতুন কোনও আইন জারী করা হয়নি। আরো কয়েকটি মুসলিম দেশ Codification-এর ভিন্নতর প্রক্রিয়া গ্রহণ করে।

উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বেই আফগানিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করে কিন্তু এই দেশটি পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে লিখিত কোনও আইন প্রণয়ন করেনি। তবে সেখানে স্থানীয় রীতি পদ্ধতি ছাড়াও পানি ব্যবহার সংক্রান্ত কিছু নিয়ম কানুন ও বিধি বিধান বিদ্যমান রয়েছে।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইরানের বিচরণ দীর্ঘকালের। প্রযুক্তির চাহিদা এবং কৃষি আধুনিকায়নের প্রয়োজনে পানির বহুবিধ ব্যবহারকে সামনে রেখে ইরান ব্যাপক আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে। ১৯২২ সাল পর্যন্ত তুর্কী সার্বভৌমত্বের অধীনে থাকলেও কার্যত ১৮৩০ সালেই উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে মিশরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। মিশরের পানি আইন ও বিধি বিধান ছিল অত্যন্ত পুরাতন, স্মরণাতীতকালের। এই দেশটি উনিশ শতকের শেষের দিকে পানি সংক্রান্ত অসংখ্য বিধি

নিষেধ প্রণয়ন করে এবং সেগুলো Codify করে এবং সবগুলোকেই মিউনিসিপাল আইনের অন্ত র্ভুক্ত করে নেয়। এখানেও পানির সকল মালিকানা রাষ্ট্রের উপর বর্তায় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এর বিতরণও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

ইতোমধ্যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত অধিকাংশ রাষ্ট্রের পানি মালিকানা ও ব্যবহার উপনিবেশিক আমলে প্রণীত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ সমস্ত দেশে পানি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এবং এর যে কোন ব্যবহার সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষ। কোন কোন রাষ্ট্রে পানি বিতরণ ও তার পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার প্যাটার্ন কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমে নিরূপিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, আফ্রিকার অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে ফরাসী ও বৃটিশ কলোনীতে পরিণত হয়েছিল (বিশেষ করে ফরাসী উত্তর, পশ্চিম ও ইকুয়েটরিয়েল আফ্রিকা এবং বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকা) এ সমস্ত পানি আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় রীতি পদ্ধতিকে সম্মান করা হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাইরে থেকে আমদানি করে মুসলিম কাস্টমারী ল'-এর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত ফ্রান্সের কন্টিনেন্টাল আইনের সরকারি ও বেরসকারি মালিকানা তত্ত্ব এবং ইংল্যান্ডের কমন ল-এর ব্যবহার তত্ত্ব এ দেশগুলোর পানি আইনে যে ছাপ রেখেছে তা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মুসলিম দেশসমূহে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং পানির চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে পানি আইন সংস্কার ও আধুনিকায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৬৮ সালে ইরানে একটি পানি আইন জারি করা হয়। আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, জর্দান, লিবিয়া, সৌদি আরব এবং সিরিয়াতেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই সব আইনে সংকীর্ণ অর্থে শুধু পানির মালিকানা ও ব্যবহারকেই প্রাধান্য দেয়া হয়নি বরং পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ড্যামের সাহায্যে কৃত্রিম প্রবাহ সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন সেচ কাজে ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের বিধি বিধানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তিউনিশিয়া, ইরাক, মিশর প্রভৃতি দেশে পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে এবং তাদের ওপর পানি ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমান প্রবণতা হচ্ছে পানিকে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে গণ্য করে জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা। সর্বসাধারণের উপকারার্থে পানির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবহার এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতিমালাই হচ্ছে এই প্রবণতার ভিত্তি যদিও পানির বেসরকারি মালিকানা স্বত্ব এবং বেসরকারি ব্যবহারের অধিকার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বলে গণ্য হয়। এ থেকে এটা পরিষ্কার যে পানি আইনের আধুনিক প্রবণতার মূল লক্ষ্য হচ্ছে এ সংক্রান্ত জনস্বার্থের ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিককরণ, যা Muslim Customary Water Law-এর প্রধান ভিত্তি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান মুখ্যতর পানির ব্যবহারকে সামনে রেখেই প্রণীত হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় পানির এই ব্যবহার গৃহস্থালীর কাজ বিশেষ করে খাওয়া রান্না বান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ধোয়া মোছা, কাপড় কাচা, গবাদি পশুর গোসল, সেচ

প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে এর সাথে মৎস্য চাষ, নৌ পরিবহন, শিল্প কারখানা পরিচালনা, পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও যুক্ত হয় এবং এ প্রেক্ষিতে পানির ব্যবহার, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, নৌ পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শহরাঞ্চলের নতুন নতুন চাহিদা প্রভৃতিকে সামনে রেখে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থা ও এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করা হয়। নদীনালা, খালবিল হাওর বাওড় প্রভৃতির খনন, পুনঃখনন ও নাব্যতার উন্নয়ন, সেচের জন্য সময় মত পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, লবণাক্ততা রোধ, জোয়ারের পানি প্রতিরোধ, নদী ভাঙ্গন রোধ শহর এলাকায় পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ, নদী ও সমুদ্র বন্দর প্রতিষ্ঠা, ফেরি সার্ভিস সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, হাইড্রলজিক্যাল সার্ভে পরিচালনা, লাইট হাউজ স্থাপন ও সংরক্ষণ, মেরিন ফিসারীর উন্নয়ন, সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্প প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও পূর্বাভাস প্রদান, সমুদ্র সম্পদ আহরণ, জাহাজ চলাচল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বয় সাধন প্রভৃতি এই সংস্থা ও এজেন্সিগুলোর দায়িত্ব। আবার কোন কোন দেশে এসব এজেন্সির কাজ কর্মকে সহজীকরণের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ওয়াটার প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন নামে স্বতন্ত্র সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

References

1. Nichelas. D. Medjelli Code during Qttoma Empire P-1-85.
2. Young, George : Water Law under Qttome Rule P-76-105.
3. Yakub Ibn Ibrahim, Abu Yusuf : Kitab al Kharaj.
4. Govt. of Bangladesh: Ground Water ordiance, 1989.
5. Govt. of Pallistan : Water and Power Development Authority ordiance 1960.

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১২, পৃষ্ঠা : ৭৯-৯৩

ইসলামে পোশাক আইন : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ নাজমুল হুদা সোহেল

এক নজরে পোশাক

ক. পোশাক ব্যবহারের ক্রমবিবর্তন।

খ. পোশাকে ধর্মীয় ও জাতিগত প্রভাব।

গ. পোশাক ব্যবহারে ইসলামের উদ্দেশ্যসমূহ।

১. সতর ঢাকা

২. সৌন্দর্য বর্ধন

৩. তাকওয়ার পরিচয় বহন করা।

ঘ. ইসলামে নিষিদ্ধ পোশাক।

১. পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক হারাম।

২. নারী-পুরুষ পরস্পরের পোশাক পরা নিষিদ্ধ।

৩. অমুসলিমদের ধর্মীয় পোশাক।

৪. অতিরিক্ত মিহি বা পাতলা কাপড়।

৫. আঁটসাঁট পোশাক।

৬. ব্যতিক্রমধর্মী ও খ্যাতিজনক পোশাক।

৭. জীব-জন্তুর ছবি সম্বলিত পোশাক।

ঙ. পোশাকের দৈর্ঘ্য।

১. পুরুষের গোছার নীচে কাপড় ঝুলানো।

২. মহিলাদের কাপড়ের ঝুল।

৩. জামার হাতা।

চ. রসূলুল্লাহ স.-এর পোশাক।

ছ. পোশাকের ডিজাইন ও কাটিং পরিবর্তনশীল।

জ. সুন্নতী পোশাক বলতে যা বুঝায়।

ঝ. প্রচলিত কতিপয় পোশাকের পর্যালোচনা।

ঞ. কিছু সুপারিশ।

লেখক : এম এ অধ্যয়নরত, আই আই ইউ সি।

ভূমিকা

পোশাক মানব সভ্যতার এক অপরিহার্য উপকরণ। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সকল সভ্য মানুষ পোশাক ব্যবহার করে আসছে। পোশাক মানুষের আভিজাত্যের প্রতীক হওয়ার সাথে সাথে আকীদা বিশ্বাস ও মূল্যবোধেরও পরিচয় বহন করে। 'Islam is a Complete and balanced code of life.' তাই পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভংগি। তবে এ দৃষ্টিভংগিতে বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা নেই। জীবনের অন্যান্য দিকের মত এক্ষেত্রেও ইসলামের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী এবং মানব কল্যাণের চিরন্তন লক্ষ্যাভিসারী।

ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট কোন মাপের বা ডিজাইনের পোশাক আবশ্যিক করে দেয়নি, তবে এমন কিছু শর্ত ও মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের পক্ষেই পালন করা সম্ভব। এ মূলনীতিগুলো অনুসরণ করে স্থান, কাল, পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুযায়ী যে কোন পোশাকই ইসলামে জায়েয। তাই পোশাকের প্রশ্নে বস্ত্রহীনতা ও অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি কোনটাই কাম্য নয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ইসলামের উদ্দেশ্য, মূলনীতি, সুন্নতী পোশাকের স্বরূপ, প্রচলিত পোশাক ইত্যাদি নিয়ে দলিলভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

ক. পোশাক ব্যবহারের ক্রমবিবর্তন

মানব সভ্যতার জনক হযরত আদম আ. থেকেই পোশাকের ব্যবহার ছিল। আদি মানবরা পোশাক হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশুচর্ম ব্যবহার করতো। তাদের সম্পর্কে নগ্নতা ও অসভ্যতার যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা সম্পূর্ণ অমূলক। এর অন্তরালে হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে পূর্বেকার সব নবী-রসূল ও তাঁদের উম্মতদেরকে অসভ্য ও বর্বর প্রমাণের হীন উদ্দেশ্য নিহিত থাকতে পারে। উল্লেখ্য, মানব জাতির ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে ডারউইনসহ অন্যান্য নাস্তিকদের মতবাদ বাস্তবতা বিবর্জিত, অন্তসারশূন্য ও বর্তমানে অনেকাংশেই বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিত্যক্ত। পোশাক হিসাবে কাপড়ের বুনন ও ব্যবহার শুরু হয়েছে হযরত ইদরীস আ. এর যুগ হতে। বর্ণিত রয়েছে, 'হুওয়া (ইদরীস) আওয়ালু মান খাতাস-ছিয়াবা ওয়া লাবিসাহা' অর্থাৎ সর্বপ্রথম হযরত ইদরীস আ.ই কাপড় সেলাই করেন এবং পরিধান করেন।[১] বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের পোশাক সম্পর্কে প্রথম ও বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায় দুই চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (পঞ্চম শতক) ও হিউয়েন সাঙের (সপ্তম শতক) ভ্রমণ বৃত্তান্তে। হিউয়েন সাঙের বর্ণনাতে যে পোশাকসমূহের বিবরণ পাওয়া যায় তা দর্জি দিয়ে তৈরি বা সেলাই করা ছিল না। পুরুষরা একটা লম্বা কাপড় কটি বেস্টন করে বাহুর নীচ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে শরীর পেঁচিয়ে ডান দিকে ঝুলিয়ে দিত। মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদও শরীরকে আচ্ছাদন করে কাঁধ ও মাথার উপর পর্যন্ত প্রসারিত হতো। পুরুষরা বয়নকৃত অথবা সূচিকর্মযুক্ত টুপি ও জপমালা পরতো।[২] ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম বিজয়ের পর বাংলার পোশাক ও সংস্কৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন আসে। সুলতানী আমলে অভিজাত ও বিত্তবান মুসলিম পুরুষ ও মহিলাগণ

মূল্যবান, রুচিসম্মত ও আকর্ষণীয় পোশাক পরতেন। পুরুষরা পায়জামা ও গোল গলাবন্ধসহ লম্বা জামা পরতেন। কোমরের সাথে চিকনকাগজসহ চওড়া ফিতা বেঁধে রাখতেন। তাদের মাথায় থাকতো পাগড়ী। তাঁরা পায়ে কারুকার্যখচিত জুতা ব্যবহার করতেন। মধ্যবিত্ত মুসলমানদের পোশাক ছিল পায়জামা, সাধারণ জামা ও পাগড়ী। সাধারণ মুসলিমরা লুঙ্গি, নিমা (খাটো জামা) ও মাথায় টুপি পরতেন। অভিজাত মুসলিম মহিলারা খাটো কামিজ ও সেলোয়ার পরতেন। তারা সূতি কিংবা রেশমী কাপড়ের ওড়না ব্যবহার করতেন। সাধারণ ও গরীব মহিলারা শুধু শাড়ি পরতেন। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সাধারণভাবে হিন্দুদের এবং বিশেষ করে অভিজাত হিন্দুদের পোশাক-পরিচ্ছদে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। অভিজাত হিন্দুদের পোশাক-পরিচ্ছদে মুসলিম প্রভাব এত বেশি বিস্তার লাভ করেছিল যে, সে সময় উচ্চ শ্রেণীর একজন হিন্দু যদি তিলক কিংবা কানের দুল ব্যবহার না করতেন তাহলে তাকে একজন অভিজাত মুসলিম থেকে আলাদা করা খুবই কষ্টকর ছিল।[৩] সাধারণ হিন্দুরা সাধারণত ধুতি ও চাদর ব্যবহার করতেন। তারা 'অঙ্গরাখি' নামে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা এক ধরনের জামাও পরতেন। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা শুধু এক প্রস্থ ধুতি পরতেন যা কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতো। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এ ধুতি কোমরে নেংটির মত জড়ানো থাকতো। হিন্দু মহিলাদের সাধারণ পোশাক ছিল শাড়ি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিমদের আগমনের পর থেকে মহিলাদের শাড়ি পরার ধরন পাল্টে যায়। মুসলিম মহিলারা শাড়ি পরার স্থানীয় রীতির সাথে বিদেশী রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শাড়ি পরার নতুন রীতি চালু করেন। তাই বর্তমান শাড়ি পরার পদ্ধতিকে মুসলিম ও হিন্দু রীতির অভিযোজন বলা যায়।

পরবর্তী যুগে এ অঞ্চলে পুরুষদের প্রিয় পোশাক হিসেবে সেলাই করা লুঙ্গি, পায়জামা, পাঞ্জাবী, ধুতি ও মহিলাদের ক্ষেত্রে শাড়ি ও ব্লাউজের ব্যবহার প্রাধান্য পায়। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে নারী-পুরুষ উভয়ের পোশাক শৈলীতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুরুষরা পশ্চিমা রীতির শার্ট, প্যান্ট, স্যুট ও টাই পরা শুরু করে। অন্যদিকে মেয়েরা শাড়ির পরিবর্তে আরবীয় ধরনের ফ্রক, সেলোয়ার-কামিজ ও অন্যান্য ডিজাইনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। পরিবর্তনের এ ধারা বর্তমানে আরো বেশি গতিশীল। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফ্যাশন ও ডিজাইনের পোশাক বের হচ্ছে। এসব নিয়ে গবেষণা করার জন্য বহু ফ্যাশন ডিজাইনার এবং প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

খ. পোশাকে ধর্মীয় ও জাতিগত প্রভাব

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ধর্ম ও জাতীয়তার গভীর প্রভাব রয়েছে। ধর্মীয় ঐতিহ্যের কারণে হিন্দুরা ধুতি, পৈতা, খৃস্টানরা ক্রুসচিহ্নিত পোশাক এবং বৌদ্ধরা গেরুয়া কাপড়ের পোশাক পরেন। মুসলমানগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লুঙ্গি, পায়জামা-পাঞ্জাবী, জুব্বা, টুপি ও পাগড়ী পরেন বিশেষত উপমহাদেশের মুসলমানরা একে সাধারণ এক ইসলামী পোশাক মনে করেন। আবার একই ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও জাতিগত কারণে বাংলাদেশী মুসলমানদের পোশাক আরব, ইরান, তুরস্ক, পাকিস্তান

ও ইউরোপের পোশাক হতে ভিন্ন ডিজাইনের। এভাবে একই দেশে বিভিন্ন উপজাতির পোশাক-পরিচ্ছদেও বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে বসবাসরত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, রাখাইন ইত্যাদি উপজাতিদের পোশাকশৈলীতে বেশ পার্থক্য রয়েছে।

গ. পোশাক ব্যবহারে ইসলামের উদ্দেশ্যসমূহ

এক্ষেত্রে প্রামাণ্য আয়াতটি হলো : (অনু.) 'হে আদম সন্তান! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এমন পোশাক (পরিধানের বিধান) নাযিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে এবং যা হবে ভূষণ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা-ই কল্যাণকর। এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আশা করা যায় তারা উপদেশ গ্রহণ করবে' (আ'রাফ ২৬)।

এ আয়াত থেকে পোশাকের তিনটি মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়।

১. সতর (লজ্জাস্থান) ঢাকা : অর্থাৎ পোশাক মানুষের সতরকে আবৃত করে রাখবে। পুরুষের সতর হচ্ছে নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত। নারীদের সতর নারীদের পরিবেশে বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং বাইরের পরিবেশে দু'হাতের তালু, দু'পায়ের পাতা ও মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত দেহ। এটা ঢেকে রাখা ফরয। সুতরাং যে পোশাক মানুষের সতর (লজ্জাস্থান) আবৃত করে না, তা পোশাক হতে পারে না।

২. সৌন্দর্য বর্ধন : পোশাক অবশ্যই ভূষণ বা শোভাবর্ধক ও সৌন্দর্য বিকাশের মাধ্যম হবে। আল্লাহ তা'আলা পোশাকের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে 'রীশ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর ব্যবহারিক অর্থ হলো ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য ও শোভাবর্ধক। অভিধানে 'রীশ' শব্দের অর্থ হলো : পাখির পালক, যা চাকচিক্যময় ও শোভাবর্ধক।[৪] আর মানুষের পোশাকও যেহেতু পাখির পালকের মতই, এ কারণে মানুষের পোশাক বাহ্যত কিরূপ হবে তা বুঝানোর জন্য ঐ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম রাযী বলেন, 'রীশ' দ্বারা সৌন্দর্যবর্ধক পোশাককে বুঝানো হয়েছে।

পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধ, ভদ্রতা, শালীনতা, রুচি ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। সুতরাং যে পোশাক ব্যক্তিকে শালীন ও সুন্দর করে না তা কুরআন সমর্থিত পোশাক নয়। অবশ্য সৌন্দর্য ও শোভার ক্ষেত্রে মানুষের রুচি পরিবর্তনশীল। স্থান, কাল, আবহাওয়া ও মানসিক অবস্থার দৃষ্টিতে এতে অনেক পার্থক্য ও পরিবর্তন হতে পারে। এ কারণে পোশাকের ধরন ও কাটিং পরিবর্তনশীল।

৩. তাকওয়ার পরিচয়বাহী : আল-কুরআনে পোশাকের ক্ষেত্রে তাকওয়ার উল্লেখ রয়েছে। অতএব পোশাক শুধু সতর ঢাকা এবং সৌন্দর্যবর্ধকই নয়, এটি একটি মনোদৈহিক বিষয়ও। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তির রুচিবোধ ও মন-মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। সুতরাং পোশাক এমন হতে হবে যা ভূষণ ও শালীন হওয়ার সাথে সাথে তাকওয়ার পরিচয়ও বহন করে। পোশাকে গর্ব-অহংকারের পরিবর্তে নম্রতা, ভদ্রতা ও বিনয়ের ছাপ থাকবে এবং এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অপচয় থাকবে না। তদুপরি মুমিনের পোশাক এমন হওয়া উচিত যা পবিত্রতারক্ষক ও নামায আদায়ের ক্ষেত্রে অনুকূল হয়।

ঘ. ইসলামে নিষিদ্ধ পোশাক

১. পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক হারাম : ইসলাম পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক ব্যবহার হারাম করেছে। এটি মহিলাদের জন্য জায়েয।[৫] রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'রেশমী পোশাক ও সোনার অলংকার আমার পুরুষ উম্মতের জন্য হারাম করা হয়েছে। আর এগুলো তাদের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে।'[৬] অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, 'তোমরা রেশমী বস্ত্র পরো না। কারণ দুনিয়াতে যে রেশমী পরলো, আখিরাতে সে তা পরতে পারবে না। তবে হানাফী মাযহাবের মতে বিশেষ প্রয়োজনে, যেমন কোন ব্যথা বা চর্মরোগ নিরাময়ের জন্য অথবা সাধারণভাবে অনূর্ধ্ব চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়েয।[৭] হযরত আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. হযরত যুবাইর রা. ও হযরত আবদুর রহমান ইবনু আওফ রা.কে তাদের উভয়ের খোসপাঁচড়ার জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসূলুল্লাহ স. দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুলের বেশি পরিমাণ রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।[৯]

২. নারী-পুরুষ পরস্পরের পোশাক পরা নিষিদ্ধ : নারী-পুরুষের জন্য একে অপরের বেশভূষা গ্রহণ করা হারাম। কারণ নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সাদৃশ্য অবলম্বন বা অনুকরণ একটি অস্বাভাবিক আচরণ ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতার আলামত। যারা এ ধরনের বেশভূষা গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ স. তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় অভিসম্পাত করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, 'রসূলুল্লাহ স. এমন সব পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন, যারা নারীসুলভ পোশাক পরিধান করে এবং এমন নারীকেও অভিসম্পাত করেছেন যে পুরুষ সুলভ পোশাক পরিধান করে।'[১০] হযরত ইবনু আব্বাস রা. বলেন, 'রসূলুল্লাহ স. এমন সব পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছেন, যারা নারীদের অনুরূপ বেশভূষা ধারণ করে এবং এমন সব নারীকেও দিয়েছেন যারা পুরুষদের অনুরূপ বেশভূষা ধারণ করে।[১১] বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক যুবতীকে পশ্চিমা অনুকরণে পুরুষের ন্যায় শার্ট-প্যান্ট পরতে দেখা যায়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম।

৩. অমুসলিমদের ধর্মীয় পোশাক : অমুসলিমদের ধর্মীয় পরিচয়সূচক পোশাক পরা হারাম অর্থাৎ যেসব পোশাকে ব্যক্তিকে স্পষ্টরূপে অন্য কোন ধর্মের লোক বলে মনে হয়। যেমন হিন্দুদের ধুতি, পৈতা, খৃস্টানদের ক্রুস চিহ্নিত পোশাক, বৌদ্ধদের গেরুয়া কাপড়ের তৈরি পোশাক ইত্যাদি। জাতীয় স্বাতন্ত্র রক্ষার খাতিরে পোশাক-আশাকেও নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষা করা আবশ্যক। কোন জাতির পক্ষে নির্বিচারে অন্য জাতির পোশাক-আশাক ও সামাজিক রীতিনীত গ্রহণ করা চরম হীনমন্যতার পরিচায়ক। এজন্যই রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।'[১২] অতএব মুসলমানদের পোশাক ও বেশভূষা এমন হওয়া উচিত যাতে তারা পরস্পরকে চিনতে পারে। উল্লেখ্য, যেসব পোশাক সাধারণভাবে সকল ধর্মের লোকেরা পরে তা ধর্মীয় পোশাক হিসেবে গণ্য নয়।

৪. অতিরিক্ত মিহি বা পাতলা কাপড় : মিহি ও পাতলা বলতে ঐ সমস্ত কাপড় বুঝানো হয়েছে যা পরার পরও নগ্ন মনে হয় অন্তর্বাস দেখা যায় এবং চামড়ার রং ও শরীরের গঠন প্রকাশ পায়। নারী-

পুরুষ উভয়ের জন্য এ জাতীয় কাপড় পরা হারাম। তবে মহিলাদের জন্য ঘরের মধ্যে যদি স্বামী ছাড়া অন্য কেউ দেখার সম্ভাবনা না থাকে– এ ধরনের কাপড় পরা বৈধ। এ ধরনের কাপড় পরে নামায পড়লে সহীহ্ হবে না।[১৩]

তদ্রূপ ঐ রূপ কাপড় ব্যবহার করাও মাকরূহ, যা পরলে গুপ্তাঙ্গ দেখা যায় না বটে; কিন্তু তার বডি আউট লাইন (যেমন শরীরের আকৃতি/গড়ন) বা বডি প্রোপাইল (যেমন শরীরের বাঁকসমূহ) বাইরে থেকে ফুটে ওঠে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. এরশাদ বলেছেন, 'অনেক নারী নামমাত্র কাপড় পরে, কিন্তু পাতলা হবার দরুন মূলত সে উলঙ্গই থাকে। তারা জান্নাতে যেতে পারবে না এবং জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[১৪] হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, একবার তাঁর বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. রসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে পাতলা কাপড় পরে প্রবেশ করলেন। রসূলুল্লাহ স. তা দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তার চেহারা ও হাতের পাঞ্জা দু'টির দিকে ইংগিত করে বললেন, 'হে আসমা, নারী বালেগা হলে এছাড়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গ দেখা যাওয়া সংগত নয়।'[১৫] এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, হযরত আসমা রা. এর পরিধেয় বস্ত্র পাতলা হওয়ার কারণে তাঁর শরীরের গঠন প্রকাশ পেয়েছিল। এ কারণে রসূলুল্লাহ স. তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

আরো বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত হাফসা বিনতে আবদুর রহমান রা. একটি পাতলা ওড়না পরিহিত অবস্থায় হযরত আয়েশা রা. এর নিকট গেলেন। তখন আয়েশা রা. ওড়নাটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাঁকে একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন।[১৬]

৫. আঁটসাঁট পোশাক : আঁটসাঁট ও স্কীন টাইট পোশাক পরলে শরীরের গঠন ও বাঁকসমূহ বাইরে থেকে ফুটে ওঠে। এছাড়া সঠিকভাবে নামায আদায় ও সহজভাবে পায়খানা পেশাবে বসা যায় না। এ কারণে শরীরে লেপ্টে থাকা আঁটসাঁট পোশাক পরা জায়েয নয়। বস্তুত মুসলমানদের জন্য টাইট প্যান্ট, শর্ট কামিজ এবং শুধু বিকিনি, সুইমিং কস্টিউম, মিডি, টেডি ইত্যাদি পরা নিষিদ্ধ। খেলাধুলা, সাঁতার বা অন্য অজুহাত এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। রসূলুল্লাহ স. সব সময় ঢিলেঢালা পোশাক পরতেন। হযরত মুআবিয়া ইবনে কুররা র. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, 'একবার আমি মুযায়না গোত্রের লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ স. এর দরবারে আসলাম। তাঁরা রসূলুল্লাহ স. এর হাতে বায়আত হলেন। সে সময় রসূলুল্লাহ স.-এর জামার বোতাম খোলা ছিল। তখন আমি আমার হাতখানা তাঁর জামার ভিতর ঢুকালাম এবং মোহরে নবুওত স্পর্শ করলাম।'[১৭] এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ স.-এর জামা এতটাই ঢিলেঢালা ছিল যে, লোকটি সহজেই এর ভিতরে তার হাত ঢুকিয়ে মোহরে নবুওত স্পর্শ করতে সক্ষম হয়।

৬. ব্যতিক্রমধর্মী ও খ্যাতিজনক পোশাক : যে ধরনের পোশাক পরলে জনসাধারণ থেকে স্বতন্ত্র কেউ– এটা প্রকাশ পায় এবং পোশাকের দরুন তার অহংকার জাহির হয়, তাই হচ্ছে ব্যতিক্রমধর্মী ও খ্যাতির পোশাক।

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির পোশাক পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার পোশাক পরিয়ে দিবেন।[১৮]

উল্লেখ্য, উৎকৃষ্ট ও দামী কাপড়ই কেবল ব্যতিক্রমধর্মী ও খ্যাতিজনক হয় না; বরং অনেক নিকৃষ্ট ও সস্তা মানের কাপড়ও এরূপ হতে পারে। যেমন কোন দরবেশ যদি সাধারণত ব্যবহৃত কাপড়ের ব্যতিক্রম কোন নিম্ন মানের পোশাক দরবেশী প্রকাশার্থে পরিধান করে, তবে তাও জায়েয নয়। ইবনু তাইমিয়্যা র. বলেন, 'খ্যাতিজনক পোশাক হলো সাধারণ্যে অপ্রচলিত উৎকৃষ্ট কাপড় আর সাধারণ্যে অপ্রচলিত নিম্নমানের কাপড়। সালাফে সালেহীন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট দুই ধরনের পোশাকের খ্যাতিকেই অপছন্দ করতেন।[১৯] হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলাল্লাহ স. দুই ধরনের খ্যাতি অর্জন করতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রসূলুল্লাহ! খ্যাতি দু'টি কি কি? তিনি বললেন, 'তা হলো কাপড় মিহি হওয়া ও মোটা হওয়া, কোমল হওয়া ও খসখসে হওয়া এবং লম্বা হওয়া ও বেঁটে হওয়া। এগুলোর মাঝামাঝি অবস্থাই হলো সঠিক ও মধ্যম ব্যবস্থা।'[২০]

সুতরাং বুঝা গেলো, ইসলাম সমর্থিত পোশাকেও ব্যতিক্রমী বা খ্যাতির প্রবণতা থাকলে তা হারাম হয়ে যায়। হযরত ওমর রা. মহিলাদের বলেন, 'জিলবাব বা হিজাবের জন্য যে কাপড় ব্যবহার করা হবে তা যেন সৌন্দর্যের দিক থেকে এমন না হয় যে, সৌন্দর্য ঢাকতে গিয়ে নিজেই সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে যায়।'[২১]

৭. জীব-জন্তুর ছবি সম্বলিত পোশাক : জীব-জন্তুর ছবি আঁকা এবং সেই ছবি সম্বলিত পোশাক পরা জায়েয নেই। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ফেরেশতাগণ এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যেখানে (জীবন্ত) কুকুর ও (প্রাণীর) ছবি রয়েছে।* হযরত আয়েশা রা. অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করেন, 'একবার তাঁর ঘরের দরজায় চিত্রাংকিত পর্দা দেখে রসূলুল্লাহ স. অসন্তুষ্ট হলেন এবং পর্দাটি ছিঁড়ে ফেললেন।'* এ হাদীস দু'টি থেকে প্রমাণিত হয়, যে কোন ধরনের প্রাণীর ছবি/ চিত্র সম্বলিত পর্দা, চাদর বা পোশাক ব্যবহার হারাম। অবশ্য যেসব চিত্রে প্রাণীর মাথা বা জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক এমন অংগ কেটে ফেলা হয়েছে তা ব্যবহার বৈধ। একবার একজন চিত্রশিল্পী হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. কে বললেন, 'আমি চিত্রাংকন ছাড়া অন্য কোন কাজ জানি না।' তখন তিনি বললেন, 'যদি তোমার একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে গাছ-গাছালি পাহাড় ও প্রকৃতির ছবি আঁকতে পারো, যাদের কোন প্রাণ নেই।'

ঙ. পোশাকের দৈর্ঘ্য

১. পুরুষের গোছার নীচে কাপড় ঝুলানো : মানুষকে দেখানো কিংবা গর্ব-অহংকারের উদ্দেশ্যে পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র গোছার নীচে ঝুলানো হারাম। পরিধেয় বস্ত্রের ঝুল কতখানি হওয়া উচিত সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদীসে। হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, 'ঈমানদার লোকদের লুঙ্গি পায়ের দুই নলার মাঝ বরাবর ঝুলতে পারে, এর নীচে যেতে পারে পায়ের গিরার উপর পর্যন্ত। এর নীচে তা জাহান্নামে যাবে।'[২২] হাদীসে 'ইযার' শব্দ ব্যবহৃত

হয়েছে। এর অর্থ পরিধেয় বস্ত্র, যা কোমরের নীচের অংশ ঢাকার জন্য পরা হয়। তা লুঙ্গি হতে পারে, পায়জামা হতে পারে, হতে পারে প্যান্ট, জামা, জুব্বা বা অন্য কিছু। এগুলো পায়ের গিরার নীচে ঝুলানো জায়েয নয়। ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি অহংকার বশত ইযার হেঁছড়িয়ে চলবে, তাকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। আর সে কিয়ামত পর্যন্ত যমীনের অভ্যন্তরে তলিয়ে যেতে থাকবে।'[২৩]

যদি কারো অনিচ্ছাবশত লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি নীচে ঝুলে যায় তা এ হুকুমের আওতায় পড়বে না। ইবনে ওমর রা. অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অহংকার বশত কাপড় ঝুলিয়ে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহতাআলা তার দিকে ফিরে তাকাবেন না। হযরত আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার অসাবধানতাবশত অনেক সময় ইযার ঝুলে যায়। রসূলুল্লাহ স. তাঁকে বললেন, তুমি তাদের মধ্যে নও যারা অহংকার করে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে।'[২৪]

কেউ যদি গর্ব অহংকার কিংবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য ছাড়াই ইযার, লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট ইত্যাদি গোছার নীচে ঝুলিয়ে পরে, তার হুকুম কি? এ ব্যাপারে জমহুর ওলামার মত হলো জায়েয নেই।

২. মহিলাদের কাপড়ের ঝুল : মহিলাদের জন্য পায়ের নলার মাঝখান থেকে এক বিঘত পরিমাণ পর্যন্ত কাপড় লম্বা করা মুস্তাহাব এবং এক হাত পরিমাণ লম্বা করা জায়েয, এর বেশি লম্বা করা যাবে না। হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় ঝুলাবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না।' এ কথা শুনে হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন, 'মহিলারা তাদের আঁচল কি করবে?' রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'তারা এক বিঘত পরিমাণ ঝুলাবে।' উম্মে সালামা রা. বললেন, 'এমতাবস্থায়ও তাদের পা খোলা থাকতে পারে। রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'তাহলে তারা এক হাত পরিমাণ কাপড় ঝুলাবে, এর বেশি নয়।'[২৫]

৩. জামার হাতা : এ ব্যাপারে সারকথা হলো, মহিলাদের জামার হাতা পুরো হাত ঢেকে রাখার মতো লম্বা হতে হবে, হাতের কব্জি পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া এবং তার অগ্রভাগ ছোট ও সংকীর্ণ হওয়াই উত্তম।

অপরদিকে পুরুষের জামার হাতা পুরো বা অর্ধেক দুই হতে পারে। রসূলুল্লাহ স. পুরো হাতাবিশিষ্ট জামা পরতেন। পুরুষের জামার হাতা তুলনামূলক প্রশস্ত হওয়া উচিত যাতে হাত নাড়াচাড়া বা কোন কিছু ধরতে অসুবিধা না হয়।

চ. রসূলুল্লাহ স.-এর পোশাক

রসূলুল্লাহ স. আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা অনুসরণ করে সেই ধরনের পোশাকই পরতেন, যা তাঁর সময়ে, তাঁর এলাকা ও জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ স. এর যুগে আরবদেশে পুরুষরা সাধারণত ইযার (লুঙ্গি), দুই খণ্ড চাদর, পায়জামা, জুব্বা, আবা,

পাগড়ী এবং মহিলারা ইযার, সেলোয়ার, কামিজ, জিলবাব, ওড়না প্রভৃতি পরিধান করতো। তাছাড়া পুরুষদের মধ্যে ইয়ামনী চাদর ও পশমী জুব্বার প্রচলন ছিল। রসূলুল্লাহ স. ইযার পরতেন, একজোড়া চাদর পরতেন, জামা পরতেন, মাথায় টুপি ও পাগড়ী পরতেন। এ কাপড়গুলোর অধিকাংশই ছিল মামুলী ধরনের ও সুতীর। তবে কোন কোন সময় বিদেশী দামী জুব্বাও পরেছেন। এর কোনটির আঁচল রেশম জড়ানো ছিল, আবার কোনটি বিভিন্ন কারুকার্য খচিতও ছিল। কখনো তিনি সুন্দর ইয়ামনী চাদরও পরেছেন, যা তৎকালীন সৌখিন আরবরাই পরতো। এ পর্যায়ে রসূলুল্লাহ স.-এর ব্যবহৃত পোশাকের বিবরণ সংক্রান্ত প্রামাণ্য কিছু হাদীস উদ্ধৃত করা হলো।

* হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন, 'রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল কামিজ।'[২৭]

* হযরত আনাস বিন মালিক রা. বলেন, 'রসূলুল্লাহ স. হিবারা (ইয়ামান দেশীয় বিভিন্ন বর্ণের ডোরাযুক্ত সূতী একজোড়া চাদর) পরতে অধিক পছন্দ করতেন।'[২৮]

* আসমা বিনতে আবু বকর রা. হতে বর্ণিত। 'একবার তিনি সূঁচিকর্ম খচিত এমন একটি জুব্বা বের করলেন, যা রেশম দ্বারা নকশী করা ছিল এবং তার গলা ও বুকের পট্টিগুলো রেশম দ্বারা জড়ানো ছিল। অতপর তিনি বললেন, এটা রসূলুল্লাহ স.-এর জুব্বা, যা হযরত আয়েশা রা. এর কাছে ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর আমি তা লাভ করি। রসূলুল্লাহ স. তা পরিধান করতেন। এখন আমরা একে ধূয়ে তার পানি দ্বারা রোগমুক্তি কামনা করি।'[২৯]

* ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'আমি রসূলুল্লাহ স. এর পরনে সুন্দরতম হুল্লা (এক জোড়া চাদর) দেখেছি।'[৩০]

* আবু বুরদা রা. বলেন, একবার হযরত আয়েশা রা. একটি তালিযুক্ত চাদর ও একটি মোটা কাপড়ের ইযার আমাদেরকে দেখিয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ স. এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ইনতিকাল করেন।'[৩১]

* হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর তিনটি টুপি ছিল। একটি ছিল মিসরীয় সাদা টুপি, (এটিই তিনি সাধারণত পরতেন)। আরেকটি ছিল ডোরাকাটা ইয়ামনী চাদরের টুপি। অপরটি ছিল কানটুপি, যা তিনি সফরে পরতেন।'[৩২]

ছ. পোশাকের ডিজাইন ও কাটিং পরিবর্তনশীল

পোশাকের ডিজাইন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সরাসরি কোন নির্দেশ নেই। পোশাক সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মূল কথা হলো, মানুষের পোশাক লজ্জাস্থান আবরণকারী, শোভাবর্ধনকারী এবং তাকওয়ার প্রতীক হতে হবে। এ পর্যায়ে হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। বিশেষ করে বুখারী শরীফের কিতাবুল লিবাস'-এ উদ্ধৃত হাদীসগুলো যাচাই করলে দেখা যায়, সেখানেও পোশাকের ডিজাইন বা কাটিং সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। শুধু একটি বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে, পোশাকের নামে অপচয় ও অহংকার বর্জন করতে হবে।

নবী করীম স. বলেছেন, 'তোমরা খাও, পান কর, পোশাক পর এবং দান-খয়রাত কর। (তবে শর্ত হলো) এতে অপচয় ও অহংকার করা যাবে না।
হযরত আব্বাস রা. বলেছেন, 'তুমি যা ইচ্ছা খেতে পার, যা ইচ্ছা পরিধান করতে পারো, যতক্ষণ দুটো জিনিস থেকে তুমি মুক্ত থাকবে : বেহুদা খরচ ও গর্ব অহংকার প্রকাশক বস্ত্র।'[৩৪] সুতরাং বুঝা গেল, এ দু'টি বিকার হতে মুক্ত যে কোন পোশাকই হাদীস মুতাবিক পোশাক এবং তা পরা সম্পূর্ণ জায়েয। আকার, ধরন, কাটিং ও লম্বা-খাটোর ব্যাপারে হাদীস থেকে বিশেষ কোন কাঠামো অনুসরণের নির্দেশ পাওয়া যায় না।
উল্লেখ্য, কোন নির্দিষ্ট কাটিং বা ধরনের পোশাক সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য উপযোগী হতে পারে না। পোশাক এমন এক জিনিস, যা সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশের সাথে সাথে পরিবর্তন হতে থাকে। তদুপরি বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথেও এর সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গরম ও শীতপ্রধান এলাকার পোশাক এক রকম হতে পারে না। তেমনি পেশার বিভিন্নতার দরুন ও পোশাকের ধরন ভিন্ন হতে বাধ্য। ইসলাম যেহেতু সমগ্র মানব জাতির জীবনাদর্শ, তাই এতে সকলকে একই কাটিং ও ডিজাইনের পোশাক পরতে বাধ্য করা হয়নি। তবে এতে পোশাকের উদ্দেশ্য ও কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক যুগে সবার জন্য মেনে চলা সম্ভব।

জ. সুন্নতী পোশাক বলতে যা বুঝায়

আমাদের আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহ পোশাকের কোন ডিজাইনকে নির্ধারণ করে দেয়নি। রসূলুল্লাহ স. বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক পরেছেন। তিনি তাঁর উম্মতকে সুন্নতী পোশাক নামে বিশেষ ধরনের কোন পোশাক পরতে নির্দেশ দেননি। বরং পোশাকের ব্যবহার ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মৌলিক কিছু সীমারেখা ঠিক করে দিয়েছেন। এই সীমারেখা লঙ্ঘিত হয় না এমন যে কোন ডিজাইন, কাটিং ও পরিমাপের পোশাকই পরা হবে তা সুন্নত অনুমোদিত পোশাক।[৩৫]

সুন্নত ও বিদআত

আমাদের দেশে বর্তমানে সুন্নতী পোশাক বলে এক ধরনের বিশেষ কাটিং ও পরিমাপের কল্লিদার কোর্তা পরিধান করা হয়। এটিকে একমাত্র সুন্নতী পোশাক হিসাবে প্রচার করা হয়। আর সুন্নতী পোশাক যে না পরবে সে ফাসিক বলে বিবেচিত হবে এবং তার পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে না। এ ধারণার কারণে সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর লোক– এ ধরনের লম্বা পাঞ্জাবী পরাকেই সুন্নত মনে করেন। শুধু নিজেরাই তা পরিধান করেন না, তাঁদের অনুসারীদেরও অনুরূপ কাটিং ও লম্বা মাপের কল্লিদার পাঞ্জাবী পরিধান করতে বাধ্য করেন। আসল কথা হলো, বিশেষ কাটিং এর পাঞ্জাবীকে একমাত্র সুন্নতী পোশাক বলার বিষয়টি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বিভিন্ন

মাপের পাঞ্জাবী এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হিসেবে পরিচিত। এটি এতদ্দেশীয় পরহেযগার আলিম ও পীর সাহেবানের পছন্দনীয় পোশাক। তাই একে 'লিবাসুল উলামা' বলা যেতে পারে। সুতরাং বুঝা গেল কুরআন ও সুন্নাহর দেয়া সীমারেখা অনুসরণ করে স্থান, কাল ও আবহাওয়ার প্রেক্ষিতে যে পোশাকই পরা হবে তা ইসলাম অনুমোদিত পোশাকের অন্তর্ভুক্ত।

খ. প্রচলিত কতিপয় পোশাকের পর্যালোচনা

১. পাঞ্জাবী, শার্ট, কোর্ট, শেরওয়ানী : শরীরের উর্ধভাগ ঢাকার জন্য যেসব জামা পরা হয় আরবীতে তার সবগুলোকে সাধারণভাবে কামিজ বলা হয়। তার কাটিং বা ধরন যাই হোক না কেন। এ হিসাবে আমাদের মাঝে প্রচলিত পাঞ্জাবী, কল্লিদার জামা, শার্ট, কোর্ট, শেরওয়ানী ইত্যাদি উর্ধাঙ্গের পোশাক কামিজের অন্তর্গত। রসূলুল্লাহ স. কামিজ খুব পছন্দ করতেন। হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন, 'রসূলুল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় পোশাক ছিল কামিজ।'[৩৭] তবে রসূলুল্লাহ স.-এর পরিহিত কামিজের কাটিং সম্পর্কে পরিষ্কার কোন বক্তব্য হাদীসে নেই। হাদীস থেকে এতটুকু জানা যায়, তিনি প্রায় এক খণ্ড বস্ত্র লুঙ্গি হিসাবে এবং এক খণ্ড চাদর হিসাবে পরতেন। তাঁর কামিজের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, 'রসূলুল্লাহ স. স্বল্প দৈর্ঘ্য জামা পরতেন, যার হাতাদ্বয় সংকীর্ণ হতো।[৩৮] অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, 'রসূলুল্লাহ স. এর কামিজ সাধারণত সূতী কাপড়ের ছিল। তার ঝুল খুব কম হতো ও আস্তিন চুরিদার হতো।'[৩৯]

আরবীয় পোশাক সম্পর্কে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, তদানীন্তন আরব সমাজে একটি কাপড় দিয়েই পুরো শরীর ঢাকার রীতি ছিল। অধিকাংশ আরব পায়জামা বা লুঙ্গির পরিবর্তে খাটো পাজামা (হাঁটু পর্যন্ত লম্বা) পরতো। এ কারণে তাদের কামিজ শরীরের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত লম্বা ছিল। আরবদের মাঝে এ অভ্যাস এখনও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু লুঙ্গি বা পায়জামা পরা সত্ত্বেও হাঁটুর নিচ পর্যন্ত কোর্তাও ওপর থেকে ঝুলে পরতে হবে এবং এরূপ কোর্তা পরা সুন্নত এ কথা কুরআন-হাদীস সমর্থিত নয়। তদুপরি আরবদের রেওয়াজ থেকেও তা প্রমাণিত হয় না। অনন্তর গরম আবহাওয়া থেকে দেহকে রক্ষার জন্যও আরবরা লম্বা জামা পরতো, যেমন শীত প্রধান দেশের জনগোষ্ঠী সমস্ত দেহ আবৃতকারী মোটা ও লম্বা পোশাক পরে।

সুতরাং নিম্নাংশে পায়জামা বা লুঙ্গি জাতীয় কিছু পরার পর কামিজ হিসেবে পাঞ্জাবীর সাথে সাথে স্বল্প দৈর্ঘ্য শার্ট, কোর্ট, শেরওয়ানী ইত্যাদি পরা অবৈধ নয়। রসূলুল্লাহ স.ও ইজার বা লুঙ্গির সাথে স্বল্প দৈর্ঘ কামিজ পরেছেন।

২. জুব্বা : জুব্বা খুব বেশি ঢিলেঢালা এক জাতীয় পোশাক। রসূলুল্লাহ স. বিশেষ করে জুমাবার ও দুই ঈদের দিন জুব্বা পরতেন। হযরত জাবির রা. বলেন, 'রসূলুল্লাহ স. এর একটি জুব্বা ছিল, যা তিনি দুই ঈদে ও জুমাবারে পরতেন।'[৪০]

হযরত আসমা বিনতে আবী বকর রা. হতে বর্ণিত, 'একবার তিনি সূচীকর্ম খচিত এমন একটি জুব্বা বের করলেন, যা রেশম দ্বারা নকশী করা ছিল এবং তার গলা ও বুকের পট্টিগুলো রেশম দ্বারা

জড়ানো ছিল। অতপর তিনি বললেন, 'এটা রসূলুল্লাহর জুব্বা, যা হযরত আয়েশা রা. এর কাছে ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর আমি তা লাভ করি। রসূলুল্লাহ স. এটা পরিধান করতেন। এখন আমরা এটা ধুয়ে তার পানি দ্বারা রোগীদের আরোগ্য কামনা করি।[৪১]

৩. **লুঙ্গি :** এর আরবী প্রতিশব্দ ইযার। শরীরের নিম্নাংশ ঢাকার জন্য এটি একটি খোলামেলা পোশাক। রসূলুল্লাহ স. সাধারণত ইযার পরতেন। হযরত আবু বুরায়দা রা. বলেন, 'একবার হযরত আয়েশা রা. একটি তালিযুক্ত চাদর ও একটি মোটা কাপড়ের ইযার আমাদেরকে দেখিয়ে বললেন, নবী করীম স. এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ইনতিকাল করেন।[৪২] রসূলুল্লাহ স. ইযার পায়ের গোছার উপরিভাগ পর্যন্ত ওপরে উঠিয়ে পরতেন।

৪. **পায়জামা :** পায়জামা একটি আদর্শ পোশাক। এটা সতরের জন্য বেশি উপযোগী। রসূলুল্লাহ স. পায়জামা কিনেছেন, কিন্তু পরেছেন কিনা এ ব্যাপারে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তিনি সাধারণত ইযার পরতেন, তবে পায়জামা পছন্দ করতেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'হে লোকেরাঃ তোমরা পায়জামা তৈরি করে নাও। কেননা এটা সতরের জন্য অধিকতর উপযোগী।'[৪৩]

৫. **ফুল প্যান্ট :** পায়জামা ও প্যান্ট প্রায় সমজাতীয় পোশাক। তবে উভয়ের কাপড় ও সেলাইয়ের ধরনে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত প্যান্ট এমনভাবে সেলাই করা হয়, যাতে টাখনুর গিরা ঢেকে যায়, তদুপরি অনেক প্যান্ট এমন আঁটসাঁটভাবে সেলাই করা হয়, যেগুলো পরে স্বাভাবিকভাবে হাজত পূরণ করা যায় না, নামায আদায় করতেও কষ্ট হয়। এ কারণে উল্লেখিত প্যান্ট পরা জায়েয নয়।

তবে প্যান্ট যদি ঢিলেঢালা হয়, যাতে পায়ের গোছা ঢেকে না যায় এবং তা পরে সহজেই হাজত পূরণ করা যায়, পবিত্রতা রক্ষা ও স্বাভাবিকভাবে নামায আদায় করা যায়, তাহলে এ ধরনের প্যান্ট পরা যেতে পারে। শার্ট প্যান্ট, কোর্ট ও টাই সম্পর্কে একটি সাংস্কৃতিক সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষণীয়। যে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিগড়ে আজ মুসলমানরা নিষ্পেষিত হচ্ছে। যে সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে মুসলমানরা দিন দিন পথভ্রষ্ট হচ্ছে, উক্ত পোশাক সে সভ্যতাই প্রবর্তন করেছে। পাশ্চাত্য এটা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও মনে মনে আনন্দিত যে, গোটা পৃথিবীকে তারা পোশাক বিকৃতিতে গ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। তাই সারা পৃথিবীর বিশেষজ্ঞ আলেমগণ মুসলিম উম্মাহর জন্য কখনো এ পোশাক পরিধান পছন্দ করেননি। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বাহক বা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাকই তাঁরা মুসলিম উম্মাহর জন্য বাঞ্ছনীয় মনে করেন। আর নেকটাই সম্পর্কে কথা হলো, অভিজাত খৃস্টানদের জন্য তাদের ধর্মগুরুরা (পাদ্রীগণ) ক্রুশ চিহ্নের বিকল্প হিসাবে টাই ক্রুশ প্রবর্তন করেন। খৃস্টানদের ধর্মীয় আইনে প্রত্যেক খৃস্টানের জন্য ক্রুশ চিহ্ন ধারণ বাধ্যতামূলক। ওআইসি'র– ফিকহ বিভাগ সর্বসম্মতভাবে মুসলমানদের জন্যে নেকটাই ব্যবহার পরিহার করার জন্য বলেছে এবং আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা রেডক্রসের পরিবর্তে মুসলিম দেশসমূহে রেডক্রিসেন্ট প্রবর্তন করেছে। তাই বিশ শতকের দু'জন বিশ্ববিখ্যাত আলেম মাওলানা সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী র. ও আয়াতুল্লাহ খোমেনী র. টাইকে খৃস্টানদের ক্রুশচিহ্নের বিকল্প প্রতীক বিধায় তাদের

লেখায় ও বক্তৃতায় মুসলমানদেরকে তা পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। আয়াতুল্লাহর আহ্বানের পর থেকে ইরানের মুসলমানরা টাই পরা ত্যাগ করেছেন। তাদের মতো আমাদেরও টাই পরিধান ত্যাগ করা কর্তব্য। কারণ অন্য জাতির ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়।

উপসংহার : আলোচ্য প্রবন্ধ হতে এ কথা পরিষ্কার যে, ইসলাম পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে যেমনি উদারতার পরিচয় দিয়েছে, তেমনি কিছু মূলনীতিও নির্ধারণ করে দিয়েছে যা সভ্যতা, শালীনতা রক্ষায় একান্ত প্রয়োজন। ইসলামের সেই মূলনীতিগুলো পালন করে নারী-পুরুষের জন্য যে কোন পোশাকই পরিধান করা অনুমোদনযোগ্য। পোশাক প্রশ্নে এই হলো ইসলামের ব্যাপকতর গ্রহণযোগ্য নীতি। তথাপি এত বৈচিত্রের মধ্যেও পোশাকে ঐক্য থাকবে কেবল আল্লাহ তাঁর রসূল স. এর দিকনির্দেশনা পালনে এবং পোশাকের ব্যাপারে শরীয়ত প্রদত্ত শর্তাদি মেনে চলার মধ্যেই। এ পর্যায়ে পোশাক সংক্রান্ত কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরছি। (মহিলাদের হিযাব স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে বিধায় এ আলোচনায় তা উল্লেখ করা হলো না)

১. পোশাক প্রশ্নে আমাদের দেশে বল্গাহীনতা ও কঠোরতা দু'ধরনের মানসিকতাই লক্ষ্য করা যায়। উভয়টিই ইসলামের সঠিক আদর্শ লালনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। তাই পোশাক বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরার জন্য সভা, সেমিনার ও লেখনীর মাধ্যমে গণসচেনতা সৃষ্ট আবশ্যক।

২. ইসলামে নিষিদ্ধ পোশাক ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্যই অকল্যাণকর। তাই একটি মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকার এগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নিতে পারে।

৩. আমাদের তরুণ-তরুণীদেরকে অশালীন, টেডি ও শর্ট কার্ট পোশাক ব্যবহারে প্ররোচিত করার জন্য ফ্যাশন হাউজগুলোই বেশি দায়ী। তাই উদ্ভট ও অশালীন ডিজাইন তৈরি রোধে স্পন্সরশীপ আরোপ করা জরুরি।

৪. বাংলাদেশে সাধারণ জনগণের জন্য নির্দিষ্ট কোন পোশাক আইন নেই। তাই বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের লাগামহীনতা রোধে একটি জাতীয় ড্রেস কোড থাকা উচিত।

৫. সর্বোপরি এসব ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. জাওয়াদ আলী, আল মুকাচ্ছাল ফী তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম, (লেবানন : দারুল ইলম, ১৯৭১ইং), খণ্ড ৮, পৃ. ১৯৮।

২. বাংলাপিডিয়া (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৫ইং), খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬১।

৩. ড. রতন লাল চক্রবর্তী ও ড. এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ, বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস, (ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ১৯৯৭ইং) পৃষ্ঠা : ৭৭।

৪. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ইং) পৃ. ৩৭৫।

৫. পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক দুটি কারণে হারাম করা হতে পারে। এক. এটিকে পুরুষের কঠিন শ্রম ও সংগ্রামী জীবন যাপনের পরিপন্থী গণ্য করা হয়েছে। দুই. ইসলামের সর্বজনীন সাম্যের দৃষ্টিতে পোশাকের সে মানকে পছন্দ করা হয়েছে, যা একজন সাধারণ মানুষের জন্যও সহজলভ্য। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানেও পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় ব্যবহার ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে।

৬. তিরমিযি, আবু ঈসা মুহাম্মদ, আল জামি, (দেওবন্দ : মাতবাআ আসাহ আল মাতাবি, তা.বি) খণ্ড ১, পৃ. ৩০২।

৭. আসসাফ, আহমদ মুহাম্মদ, আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, (বৈরুত : দারু ইহয়া আল-উলুম, ১৯৮৮ইং) পৃ. ৫৪৫।
৮. বুখারী, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, আল-জামি, (দেওবন্দ : মাতবাআ আসাহ আল-মাতাবি তা.বি) খণ্ড ২, পৃ. ৫৬১।
৯. মুসলিম আস সহীহ, (দিল্লী : কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, তা.বি), খণ্ড ২, পৃ. ১৯২ তিরমিযি, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩০২।
১০. আবু দাউদ, সুলায়মান, আস সুনান (কলিকাতা : দারুল ইশাআত আল ইসলামিয়া, তা.বি) খণ্ড ২, পৃ. ৫৫৯।
১১. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৫৬৬; বুখারী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৮৭৪।
১২. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৫৫৯।
১৩. ড. আহমদ আলী, ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক, (চট্টগ্রাম : পাইওনিয়ার ট্রাস্ট, ২০০৫ ইং) পৃ. ৪০।
১৪. মুসলিম, প্রাগুক্ত, (কিতাবুল লিবাস) হাদীস নং ৩৯৭১।
১৫. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, (কিতাবুল লিবাস) হাদীস নং ৩৫৮০।
১৬. বায়হাকী, আস-সুনান, খণ্ড ২, পৃ. ২৩৫।
১৭. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৫৬৪।
১৮. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৫৫৮; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, (দেওবন্দ : মাকতাবা আল-আশরাফিয়া, তা.বি), খণ্ড ২, পৃ. ২৫৭।
১৯. ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, খণ্ড ২২, পৃ. ১৩৮।
২০. বায়হাকী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ২৭৩।
২১. ফিকহে উমর রা. হিজাব শিরোনাম।
* বুখারী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৮৮০।
* বুখারী, প্রাগুক্ত, (কিতাবুল আদব), হাদীস নং ৫৬৪৪।
২২. মুসনাদে আহমদ।
২৩. বুখারী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৮৬১।
২৪. বুখারী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৮৬০; আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২ পৃ. ৫৬৫।
২৫. তিরমিযি, প্রাগুক্ত (কিতাবুল লিবাস), হাদীস নং ১৬৫৩।
২৭. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৫৫৮; তিরমিযি, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩০।
২৮. বুখারী, মুসলিম।
২৯. মুসলিম, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ১৯০।
৩০. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২।
৩১. বুখারী, প্রাগুক্ত।
৩২. ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তফা, (পাকিস্তান, লায়ালপুর, ১৯৯৭), পৃ. ৫৬৭-৫৬৮।
৩৩. বুখারী, কিতাবুল লিবাস, প্রাগুক্ত।
৩৪. বুখারী, কিতাবুল লিবাস, ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত।
৩৫. মাওলানা আব্দুর রহীম, সুন্নত ও বিদআত (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৩) পৃষ্ঠা ২৫৫।
৩৬. মাওলানা আব্দুর রহীম, সুন্নত ও বিদআত, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৩) পৃ. ২৫৮।
৩৭. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৫৫৮।
৩৮. ইবনু মাজাহ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ,সুনান (দেওবন্দ : আল মাকতাবা আল আশরাফিয়্যাহ, তা. বি) কিতাবুল লিবাস হাদীস নং ৩৫৬৭।
৩৯. আল-মিরকাত, খণ্ড ৪, পৃ. ৪২৩।
৪০. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, (কুয়েত : আওকাফ মন্ত্রণালয়, ১৯৫৫ইং) খণ্ড ৬, পৃ. ১৩৮।
৪১. মুসলিম, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ১৯০।
৪২. বুখারী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৮৬৫।
৪৩. ড. আব্দুল আযীয, আল লিবাস ওয়ায যিনাত, পৃ. ২৬৭।

ক. আল কুরআনুল কারীম।
খ. আল হাদীস।
১. বুখারী, আল জামি, দেওবন্দ।
২. মুসলিম, আল-সহীহ, দিল্লী : কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ।

৩.	আবু দাউদ, আল সুনান, কলিকাতা: দার-আল-ইশায়াত আল ইসলামিয়া।
৪.	তিরমিযি, আল-জামি, দেওবন্দ।
৫.	ইবনু মাজাহ, আস সুনান, দেওবন্দ।
৬.	আহমদ, ইবনে হাম্বল, আল মুসনাদ, বৈরুত: দারুল ফিকর।
৭.	বায়হাকী, আস সুনান।

গ. অন্যান্য গ্রন্থ

১.	জাওয়াদ আলী, আল মুফাচ্ছাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম, লেবানন।
২.	বাংলাপিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
৩.	ড. রতন লাল চক্রবর্তী ও ড. এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ, বাংলাদেশ ও প্রাচীণ বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস, ঢাকা।
৪.	ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, ঢাকা।
৫.	আহমদ মুহাম্মদ, আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, বৈরুত, লেবানন।
৬.	ড. আহমদ আলী, ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক, চট্টগ্রাম।
৭.	ইবনু তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া।
৮.	ফিকহে ওমর।
৯.	ইবনে জাওযী, আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তফা, পাকিস্তান।
১০.	মাওলানা আব্দুর রহীম, সুন্নত ও বিদআত। ঢাকা।
১১.	আল-মাওসূসাতুল ফিকহিয়্যাহ। কুয়েত।
১২.	ড. আব্দুল আযীয, আল লিবাস ওয়াজ যিনাত, মিশর।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১২, পৃষ্ঠা : ৯৪-১০৬

ইসলামী দণ্ডবিধি

ড. আবদুল আযীয আমের

। বারো ।

নর হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধের শাস্তি

অপরাধ সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই আমরা প্রমাণ করেছি যে, জনস্বার্থে ও অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন কোন সময় হদ্দ ও কিসাসের শাস্তির সাথে তা'যিরী শাস্তিও দেয়া যায়। অবশ্য মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে এ ধরনের তা'যিরী শাস্তি যোগ হওয়ার কোনই অবকাশ নেই। কারণ মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়ার পর একই অপরাধীকে তা'যিরী শাস্তি দেয়ার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই, বরং মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত অপরাধীর ওপর এটি জুলুম হিসেবে বিবেচিত হবে। এ সম্পর্কে পূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

নর হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে তাযিরী শাস্তির কি বিধান, এ নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করবো। এসব অপরাধ ভুলবশত হোক আর ইচ্ছাকৃত হোক, তাতে যদি কোন কারণে হদ্দ বা কিসাস কার্যকরী না হয় তবে কি ধরনের তাযিরী শাস্তি কার্যকর হবে?

এ প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতেই আমরা নজর দেবো, ইচ্ছাকৃত যেসব অপরাধে কিসাস কার্যকর হয় না সেগুলোর দিকে। যেমন নর হত্যা অথবা এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের ইচ্ছাকৃত অপরাধ কিংবা ইচ্ছাকৃত অপরাধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অপরাধ। এরপর নর হত্যা ও হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের সেইসব অপরাধ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে যেগুলো ভুলক্রমে সংঘটিত হয়। এসব অপরাধে তা'যিরী শাস্তি প্রয়োগ জায়েয বা নাজায়েয এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। সবশেষে ঐসব অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে মানব দেহে যেসব অপরাধের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না।

এক. ইচ্ছাকৃত যে নর হত্যায় কিসাস কার্যকর হয় না

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, ইচ্ছাকৃত নর হত্যায় যদিও ক্ষয়ক্ষতি শুধু নিহত ব্যক্তিরই হয়ে থাকে কিন্তু এই অপরাধ গোটা সমাজ ব্যবস্থারই ক্ষতিসাধন করে। ইসলামী শরীয়ত ইচ্ছাকৃত নর হত্যায় কিসাসের বিধান রেখেছে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের কিসাস (সম-প্রতিশোধ) কার্যকরী করার ক্ষমতা প্রদান করেছে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এর প্রতিকার

হয়। কিন্তু নিহতের উত্তরাধিকারীগণ যদি কিসাস ক্ষমা করে দেয় অথবা অন্য কোন কারণে কিসাস রহিত হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে দিয়্যাত (অর্থদণ্ড) ধার্য হয়। বস্তুত নিহতের উত্তরাধিকারীগণ যদি দিয়্যাতও ক্ষমা করে দেয় তবে এমতাবস্থায় সমাজ কি অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারে, যাতে চিহ্নিত এক অপরাধী গুরুতর অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে না যায়?

হত্যাকারীর কিসাস যদি নিহতের বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ক্ষমা করে দেয় এমতাবস্থায় অপরাধীকে কোন তা'যিরী শাস্তি দেয়া হবে কি-না এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতভিন্নতা রয়েছে। ইমাম মালিক র. ও ইমাম লাইছ র. বলেন, ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর কিসাস যদি ক্ষমা করে দেয়া হয় তবে তাকে একশত বেত্রাঘাত করা হবে এবং এক বছরের কারাদণ্ড দেয়া হবে। মদীনাবাসী ফকীহগণ এমতের পক্ষে। হযরত উমর রা. থেকেও এমন অভিমতই সংকলিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা র., ইমাম শাফিয়ী র., ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র., ইমাম ইসহাক র. ও ইমাম আবু ছাওর র. বলেন, যদি নর হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তির কিসাস ক্ষমা করে দেয়া হয়, অথচ সে পেশাদার অপরাধী, তাহলে সমকালীন শাসক নিজ ক্ষমতা বলে তাকে উপযুক্ত যে কোন তা'যিরী দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।[১]

ইমাম ইবনে হাযম র. বলেন, উত্তরাধিকারীগণ হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার পর আর তাকে কোন ধরনের শাস্তি দেয়া জায়েয নয়। 'ক্ষমা ঘোষণার পর অপরাধীর আর কোন শাস্তি নেই', যারা এই মত পোষণ করেন, তাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা র. ইমাম শাফিয়ী র. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এবং আবু সুলাইমান ও তার সঙ্গীবৃন্দ রয়েছেন। ইমাম ইসহাক, ইবনে রাহওয়ায়হ্ এবং আহলে হাদীসগণও একই মত পোষণ করেন। ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীস এমত পোষণকারীদের দলিল। হাদীসটি হলো, 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিসাস বলবৎ ছিল, কিন্তু রক্ত ঝরানোর কোন শাস্তি ছিল না। ইসলামের আগমনের পর কুরআন কারীম ঘোষণা করেছে, 'হে ঈমানদারগণ! নিহতের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা এবং সততার সঙ্গে তার দেয় আদায় করা বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমা লংঘন করে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৭)

ক্ষমার অর্থ হলো ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে কিসাসের পরিবর্তে দিয়্যাত গ্রহণে সম্মত হওয়া। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ রেয়াত এবং দয়া। এজন্য হত্যাকারীর কর্তব্য যথারীতি দিয়্যাত আদায় করা। এরপরও যদি কোন পক্ষ সীমা লংঘন করে তবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে বলে আল্লাহ তাআলা হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে যেসব ফকীহ দিয়্যাতের সাথে তা'যিরী শাস্তি প্রদানের পক্ষে, তারা নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, 'আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না এবং ব্যভিচার করো না, যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে।' (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৬৮)

এখানে হত্যাকাণ্ডকে ব্যভিচারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কোন বিবাহিত কিংবা বিবাহিতা যদি যেনা করে তবে তার শাস্তি হলো, প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। আর যদি বিবাহিত না হয় তবে মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হত্যাকারীকে যদি কোন কারণে মৃত্যুদণ্ড দেয়া না যায় তবে তার ওপর অন্তত অবিবাহিতের শাস্তি কার্যকর হবে। এমতাবলম্বীগণ তাদের মতের পক্ষে রসূল স.-এর একটি হাদীসও উদ্ধৃত করেন। 'একবার রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এমন এক লোককে হাজির করা হলো, যে তার গোলামকে হত্যা করেছে। রসূল স. তাকে এক শত বেত্রাঘাত করলেন এবং এক বছরের নির্বাসন দণ্ড দিলেন। এবং গনীমতের সম্পদে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে সেও যে অংশের অধিকারী হয়েছিল তার সেই অংশ রসূল স. বাতিল করে দেন, কিন্তু তার ওপর কিসাসের দণ্ড, কার্যকর করেননি। এই ঘটনাটি হযরত উমর রা.-এর বর্ণিত ঘটনা নয়।

ফকীহ ইবনে হাযম বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে কিসাস রহিত করার ব্যাপারটিকে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, যেনাকে হত্যার সাথে তুলনা করা এক প্রকার কিয়াস। হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে কিয়াসের কোন কার্যকারিতা নেই; এখানে কিয়াস বাতিল। তর্কের খাতিরে কিয়াসকে কার্যকরী ধরে নিলেও এখানে কিসাস ও যেনার মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার। আল্লাহ তাআলা হত্যাকারী ও যেনাকারীকে ইহজাগতিক কোন ব্যাপারের সমতুল্য বলেননি, বরং আখেরাতের ব্যাপারে তাদেরকে একই ধরনের শাস্তির হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে।[২]

গ্রন্থকার ড. আবদুল আযীয আমের বলেন, আমার মত হলো, হত্যাকারীর কিসাস যদি ক্ষমা করে দেয়া হয় তাহলে তার অবস্থা ও পারিপার্শিকতা বিচার করে উপযুক্ত তা'যিরী শাস্তি দেয়া উচিত। মানবিক চাহিদাও তাই দাবি করে। অপরাধীদের সংশোধনের জন্যও তাদের শাস্তি দেয়া জরুরী। পক্ষান্তরে এর বিপরীত মত যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে কিসাস ক্ষমা করে দেয়ার পর অপরাধী সব ধরনের শাস্তি থেকেই রেহাই পেয়ে যায়। কারণ নিহতের উত্তরাধিকারীগণ অনেক ক্ষেত্রে দিয়্যাতও ক্ষমা করে দেয়। তখন অপরাধী সব ধরনের শাস্তি থেকেই খালাস পেয়ে যায়। অথচ সে গুরুতর একটা সামাজিক অপরাধ করেছে, আল্লাহ তাআলার কর্তৃক পবিত্র ঘোষিত নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে।

কিসাস প্রয়োগের শর্তগুলোর মধ্যে যদি কোন শর্ত অপরাধীর মধ্যে বিদ্যমান না থাকে তবে অপরাধীকে বিনা বিচারে ছেড়ে না দিয়ে তা'যিরী শাস্তি দিতে হবে। যেমন, পিতা পুত্রকে হত্যা করেছে এ ক্ষেত্রে যারা পুত্র হন্তা পিতাকে কিসাসের শাস্তি স্বরূপ হত্যার বিপক্ষে, তারা বলেন, এমতাবস্থায় পিতার বিরুদ্ধে তা'যিরী শাস্তি কার্যকরী হবে। অনুরূপ হত্যার হুকুমদাতা এবং হত্যা বাস্তবায়নকারীর শাস্তির ক্ষেত্রে এবং কোন কারণে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে যারা কিসাস কার্যকর করার বিপক্ষে তারাও উল্লেখিত অবস্থাগুলোতে তা'যিরী শাস্তিদানের পক্ষে। মোটকথা, যেসব অবস্থায় কোন কারণে অপরাধীর ওপর কিসাস কার্যকরী হয় না, সেসব ক্ষেত্রে তা'যিরী শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কারণ অপরাধী যে অপরাধ কর্ম করেছে, তা সর্বাবস্থায় হারাম। যেহেতু এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট শাস্তি দেয়ার অবকাশ নেই সেহেতু তা'যিরী শাস্তি প্রয়োগ করা জরুরী।[৩]

দুই. ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের অপরাধে তা'যিরী শাস্তি

হানাফী ফকীহদের সর্বসম্মত মূলনীতি হলো, হত্যার যেসব অবস্থায় কিসাস কার্যকরী হয় না, যেমন বড় কাঠ, পাথর কিংবা এ ধরনের ভারী জিনিসের দ্বারা কৃত হত্যা, এসব অপরাধ যদি একই অপরাধ দ্বারা একাধিকবার ঘটে তাহলে প্রশাসন তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে, যদি তাতে কোন সার্বিক কল্যাণ থাকে। যেমন কোন অপরাধী কাউকে শ্বাসরোধ করে, পানিতে ডুবিয়ে অথবা উঁচু জায়গা থেকে নীচে ফেলে হত্যা করার ঘটনা বারবার ঘটায়, তাহলে তা'যীরের আওতায় তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়, যদি তাকে বিরত রাখার অন্য কোন পথ না থাকে। ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে যদিও কিসাস ওয়াজিব হয় না কিন্তু এগুলোও হত্যাকাণ্ডের একটি ধরন। আর হত্যাকাণ্ডে মৃত্যুদণ্ড বিধেয়।

ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের কোন কোন অবস্থায় এবং কিছু শর্তের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা যায়, যেহেতু এই অপরাধে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অপর সব ধরনের শাস্তি অবশ্যই প্রযোজ্য। কেননা এক্ষেত্রে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, তার অনিষ্ট থেকে মানুষকে নিরাপত্তা দেয়া। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া যদি অন্য কোন উপায়ে এই উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তাহলে তাযিরী শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত অন্য কোন শাস্তি প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।

ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের যদি পুনরাবৃত্তি না ঘটে

অপরাধী যদি ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না ঘটায়, প্রথম সে এমন একটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে, তাহলেও তাকে তা'যিরী শাস্তি দেয়া হবে কি-না? 'কাশশাফুল কিনা' গ্রন্থের রচয়িতা 'আল-মাবদা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডেও তাযিরী শাস্তি ওয়াজিব। কেননা, এই অপরাধে যে বাধ্যতামূলক কাফফারা প্রযোজ্য হয় তা আল্লাহর হক হিসেবে বিবেচিত, যেমন ভুলকৃত হত্যাকাণ্ডে ধার্যকৃত কাফফারা আল্লাহর হক হিসেবে সাব্যস্ত। এই কাফফারা নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের অপরাধে প্রযোজ্য হয় না, বরং সেই জীবনের প্রতিদান হিসেবে অপরাধীর কাফফারা দিতে হয়, তার যে ভুলের কারণে একটি জীবনহানি ঘটেছে।[৪] গ্রন্থকার বলেন, কয়েকটি কারণে এই বিবেচনা ঠিক হতে পারে–

১. ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডও মানবজীবনের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ। এই ক্ষেত্রে অপরাধীর কৃত কাজটির ফলে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় তা ইচ্ছাকৃত। অতএব এটি একটি ভয়ংকর অপরাধ তাতে কোন দ্বিমত নেই। এটিও ইচ্ছাকৃত অপরাধ সদৃশ্যই। কারণ ইচ্ছাসদৃশ অপরাধেও ব্যক্তির জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইসলামী সমাজের অধিকার খর্ব হয়। ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতির প্রতিদান উচ্চমূল্য দিয়্যাতের মাধ্যমে করা হয় কিন্তু এই প্রতিদান সরকার বা সমাজ পায় না, পেয়ে থাকে নিহতের উত্তরাধিকারীরা। বস্তুত সাধারণ ও প্রসিদ্ধ অর্থে এটিকে নিরেট শাস্তি বলা যায় না। যদিও দিয়্যাত আদায় করার পর হত্যাকারীর প্রতি নিহতের উত্তরাধিকারীদের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ কমে যায়, পক্ষান্তরে অপরাধীও বিরাট সম্পদের ক্ষতির চাপে পিষ্ট হয়, তাতে এক

ধরনের সতর্কতামূলক হুঁশিয়ারীও থাকে। ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের শাস্তিতে যারা দিয়্যাতের পাশাপাশি কাফফারা ধার্যের কথাও বলেন, তাদের মতেও এটি কোন সাধারণ শাস্তি নয়। বস্তুত ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে কাফফারার অবস্থান ও ভুল হত্যাকাণ্ডের শাস্তির সমতুল্য। অবশ্য ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে অপরাধী গোটা সমাজের অধিকার ক্ষুণ্ন করে। সামাজিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা একটি তা'যিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কারণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং জন-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসন তা'যিরী শাস্তি দিয়ে থাকে।

২. পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী এ ধরনের অপরাধে নির্ধারিত শাস্তির পাশাপাশি তা'যিরী শাস্তি প্রয়োগে বাধা নেই। এর আগে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি, যদি কোন কল্যাণকর দিক থাকে তবে কাফফারা, কিসাস এবং স্বয়ং হদ্দের সাথে তা'যিরী শাস্তিও দেয়া যায়।

নিবন্ধকার বলেন, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে সামাজিক কল্যাণের বিবেচনায় নির্ধারিত শাস্তির সাথে তাযিরী শাস্তিও দেয়া উচিত। কারণ এ প্রকারের হত্যাকাণ্ডে যে শাস্তি নির্ধারিত আছে এগুলো একটি বিশেষ প্রকৃতির, প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ অর্থে নিরেট শাস্তি নয়। অপরদিকে ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ড এমন একটা অপরাধ যা শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল সমাজের জন্যে বিরাট বিপদস্বরূপ এবং সামাজিক জীবনের সীমারেখার প্রকাশ্য লংঘন। কেননা সামাজিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশলতা রক্ষা করাই সামাজিক জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

যদিও ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে কারো ক্ষতি করার কোন ইচ্ছা অপরাধীর থাকে না, তবুও তা অপরাধের ভয়াবহতাকে মোটেওহ্রাস করে না। তাছাড়া ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের হদ্দ এর সাথে যদি তা'যিরী শাস্তির ব্যবস্থা না রাখা হয় তাহলে লোকজন এ ধরনের অপরাধ সংঘটনে বেপরোয়া হয়ে ওঠবে। বিশেষত, যারা বিত্তশালী, যাদের পক্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা-পয়সা ও কাফফারা দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার ক্ষমতা থাকবে, তারা এ ধরনের অপরাধকে মামুলী ঘটনা মনে করে তা থেকে দূরে থাকার কোন চেষ্টাই করবে না।

৩. (যারা ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে হদ্দ এর পরিবর্তে কাফফারা ও দিয়্যাতের শাস্তি প্রয়োগের পক্ষে) সেক্ষেত্রে কাফফারাও দিয়্যাতের সাথে যদি তা'যিরী শাস্তি কল্যাণজনক মনে হয়, তবে দিয়্যাত ক্ষমা হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তা'যিরী শাস্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে উপলব্ধি করা যায়। কারণ প্রশাসনের দিয়্যাত ক্ষমা করার অধিকার নেই, দিয়্যাত ক্ষমা করতে পারে নিহতের উত্তরাধিকারীগণ। আমরা যদি হদ্দ ও কিসাসের সাথে তা'যিরী শাস্তি দানের বিষয়টি নাকচ করে দেই, তবে যারা ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে কাফফারার পক্ষে নন, তাদের মতাবলম্বী এ প্রকৃতির অপরাধীরা সব ধরনের শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যারা শুধু কাফফারার শাস্তি প্রয়োগের পক্ষে তাদের মতে অপরাধী শুধু কাফফারা দিয়েই ছাড়া পেয়ে যাবে। উল্লেখিত উভয় অবস্থা অপরাধ নিয়ন্ত্রণে উপযোগী নয়।

৪. ফকীহদের এক দল হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ, যেমন কোন অংগচ্ছেদ, শিজাজ (মস্তকের আঘাত) ও জখম ইত্যাদির ক্ষেত্রেও কিসাসের পাশাপাশি তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের পক্ষে।

ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে হদ্দ এর সাথে তাযিরী শাস্তি প্রয়োগ তাদের মতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল দেখা যায়। কারণ অপরাধকর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং মানবজীবনের বিরুদ্ধে সংঘটিত হত্যার চেয়ে নিম্নতর অপরাধকর্মের মধ্যে তেমন তারতম্য নেই।

তিন. হত্যার চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের অপরাধে তাযিরী শাস্তি

কেউ যদি হত্যার চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের অপরাধ করে এবং তাতে আক্রান্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গ কেটে যায় কিংবা অঙ্গের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় অথবা আঘাতে শিজাজ বা জখম সৃষ্টি হয় তবে এ ধরনের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কিসাস, দিয়্যাত, নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট জরিমানামূলক শাস্তি প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এ পর্যায়ে উল্লেখিত অপরাধগুলোতে শুধু তা'যিরী শাস্তিদান প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

প্রশ্ন হলো, ক্ষমা করার কারণে যদি কিসাস রহিত হয়ে যায়, অথবা কিসাস কার্যকর করার শর্তাবলীর কোনটি বিদ্যমান না থাকে, অথবা কিসাস প্রয়োগ অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে দিয়্যাত ও জরিমানার পাশাপাশি কি অপরাধীকে তাযিরী শাস্তিও দেয়া যেতে পারে কিনা? অথবা অবস্থা যদি এমন হয় যে, এক্ষেত্রে কিসাস, দিয়্যাত, জরিমানা কোনটাই বাধ্যকর হয় না, এমতাবস্থায় অপরাধীকে তা'যিরী শাস্তি দেয়া যাবে কিনা?

ইমাম মালিক র.-এর অভিমত : ইতোপূর্বে আমরা বলেছি, হত্যার চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের অপরাধে ইমাম মালিক র. কিসাসের সাথে তা'যিরী শাস্তি দানের পক্ষে। এ ধরনের অপরাধে যদি কিসাস রহিত হয়ে যায় কিংবা কিসাস প্রয়োগ কোন কারণে স্থগিত হয়ে যায়, এমতাবস্থায় ইমাম মালিক র.-এর মতে তাতে দিয়্যাত ও জরিমানার পাশাপাশি কিংবা জরিমানা ছাড়া অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী তা'যিরী শাস্তি দেয়া যেতে পারে। যেমন– অতি গুরুত্বপূর্ণ হাড়ের কোন একটি হাড় পর্যন্ত যদি আঘাত পৌঁছে যায় কিংবা তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; এমতাবস্থায় ইমাম মালিক র.-এর মতে কিসাস ধার্য হয় না। যেমন, মেরুদণ্ডের হাড়, রান বা ঘাড়ের হাড় অথবা মুনাক্কিলা বা মামুমা পর্যায়ের আঘাত। জায়েফা পর্যায়ের আঘাতের ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য। কেননা জায়েফাতেও কিসাস কার্যকরী করা সম্ভব নয়।[৫]

যদি আঘাতের কারণে কোন অঙ্গের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় বটে কিন্তু সেই অঙ্গটি যথাস্থানে বহাল থাকে এবং অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্টের দ্বারা দৃশ্যত সৌন্দর্যহানি না ঘটে; যেমন অপরাধীর আঘাতের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে বটে কিন্তু চোখ যথাস্থানে বহাল আছে এবং আক্রান্তের দৈহিক সৌন্দর্যে কোন ত্রুটি হয়নি তাহলে এতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ হাতের কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু হাতের অবয়বে কোন বিকৃতি ঘটেনি। মোটকথা এ ধরনের সব অবস্থায় অপরাধীর কাছ থেকে দিয়্যাত আদায় করে তাকে তা'যিরী দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।[৬]

অন্যান্য ইমামগণের অভিমত : হানাফী ও শাফিয়ী মতাবলম্বী সকল ফকীহর অনুসৃত মূলনীতি হলো, কোন অপরাধী যদি একই অপরাধ বারবার করে এবং এজন্য সে বারবার শাস্তিও ভোগ

করতে থাকে, কিন্তু এরপরও অপরাধ সংঘটন থেকে নিবৃত্ত না হয় তখন তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া যাবে।[৭] উল্লেখিত ফকীহদের মতে, বারংবার একই অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পরও এই দণ্ড তাকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে ফলপ্রসূ হচ্ছে না। তখন তার জন্য আরো কঠিন শাস্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অবস্থা ও পরিস্থিতিও তাই প্রত্যাশা করে।

গ্রন্থকারের মতামত : হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধে নির্দিষ্ট শাস্তির সাথে বিভিন্ন কারণে তা'যিরী শাস্তির বিধানও থাকা জরুরী।

১. অপরাধের দিক থেকে হত্যার সাথে হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ও তার পরিজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু কিসাস, দিয়্যাত ও জরিমানার অর্থ সমাজ পায় না, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গই পেয়ে থাকে এবং তাতে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষতির প্রতিদান দেয়া হয় কিন্তু সামাজিক যে ক্ষয়ক্ষতি হয় এর প্রতিদান তা'যিরী শাস্তির দ্বারাই দেয়া সম্ভব।

২. এ ধরনের অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অপরাধীর কিসাস ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার রাখে। আবার কখনো কিসাসের শর্ত না থাকার কারণে শাস্তি প্রয়োগ হয় না কিন্তু অপরাধ তো ঠিকই ঘটেছে। এ ধরনের অপরাধের তা'যিরী শাস্তি নেই বলা হলে অপরাধীর ওপর দিয়্যাত ও জরিমানা ছাড়া আর কোন শাস্তি প্রয়োগের অবকাশ থাকবে না। তখন বিত্তশালী লোকদের এ ধরনের অপরাধ সংঘটনে বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হবে।

৩. ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা আক্রান্ত ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে দিয়্যাত ক্ষমা করে দেয়, আর এই ক্ষমার অধিকার তার আছে। এসব অপরাধে এমন অবস্থাও কখনো হতে পারে, অনেক ফকীহর মতে সেখানে জরিমানা সাব্যস্তই হয় না। যেমন শিজাজ-এর পর্যায়ভুক্ত আঘাতে যদি ক্ষতস্থান ভরাট হয়ে যায় এবং তার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে তবে আবু হানিফা র. এর মতে কোন জরিমানা সাব্যস্ত হবে না।[৮] এমন অবস্থায় যদি তাযিরী শাস্তির ব্যবস্থাও না থাকে, তাহলে অপরাধী সব ধরনের শাস্তির উর্ধে থেকে গেল, যা অপরাধ ও দণ্ডবিধির দৃষ্টিতে মোটেও যৌক্তিক ও কাঙ্ক্ষিত নয়।

৪. ভুলবশত হত্যা এবং এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধ ও তা'যিরী শাস্তি

ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়েও আলোচনা করেছি, ভুলবশত হত্যা ও এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে অবস্থাভেদে কখনো দিয়্যাত, কখনো জরিমানা সাব্যস্ত হয়। এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করবো, উল্লেখিত অপরাধসমূহে তা'যিরী শাস্তি প্রযোজ্য কি না?

ভুলবশত হত্যা কিংবা হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ সমাজে বেশি ঘটে– ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জরুরি নিরাপত্তামূলক সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন না করার কারণে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি পূর্ণ সতর্ক ও সচেতনভাবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি করতো তাহলে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতো না। বৈধ কাজটিও সম্পন্ন করার আগে তার উচিত ছিলো এ ব্যাপারে পূর্ণ প্রস্তুতি এবং প্রাসঙ্গিক সব ধরনের ঝুঁকি থেকে অন্যদের নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সংশ্লিষ্টদের অসতর্কতা, অবহেলা কিংবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণে কারো অঙ্গহানি ঘটে, কারো হাত-পা কেটে যায়, কারো অংগ বিকল হয়ে যায়। ইত্যাকার দুর্ঘটনার শিকার হয় সাধারণ মানুষ, তাতে স্বাভাবিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অপরাধী মনে হয় না। কিন্তু যে বা যারা এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ শুরু করার আগে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, উপযোগী ব্যবস্থা ও সর্বোত্তম কৌশল প্রয়োগ করেনি– দুর্ঘটনায় সাধারণ মানুষের ক্ষয়ক্ষতির জন্য নিশ্চয়ই তারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে। আমরা আগেই বলেছি, যে কোন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অসতর্কতা, অবহেলা, উপযুক্ত প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহার না করা অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

নিবন্ধকার বলেন, উল্লেখিত অপরাধে শুধু জরিমানা কিংবা দিয়্যাতের শাস্তি প্রয়োগ সঠিক নয়। এ ধরনের অপরাধে তাযিরী শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধী শাস্তির আওতায় নাও আসতে পারে। যেমন, অপরাধীর দিয়্যাত ও জরিমানা ক্ষমা করে দেয়া হলে তার কোন শাস্তিই হবে না। বস্তুত দিয়্যাত ও জরিমানা প্রকৃত শাস্তি নয়, কারণ এটির মালিক হয় নিহতের উত্তরাধিকারীগণ। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যে সামাজিক অপরাধ করেছে তার জন্য নির্দিষ্ট জরিমানা ও দিয়্যাতের পাশাপাশি তা'যিরী শাস্তির ব্যবস্থাও থাকা জরুরি।

উল্লেখিত অপরাধের ক্ষেত্রে এমন অবস্থাও হয়, যাতে ফকীহদের মতে দিয়্যাত বা জরিমানা কোনটাই প্রযোজ্য নয়। সেক্ষেত্রে তা'যিরী শাস্তির ব্যবস্থা না রাখা হলে অপরাধ ঘটবে কিন্তু কোন শাস্তি দানের সুযোগ থাকবে না। এমনটি আইনের দৃষ্টিতে মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। যেমন ধরুন, ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে, মাথা ও মুখমণ্ডলের আঘাত যদি ঠিক হয়ে যায় এবং আঘাতের চিহ্নও লুপ্ত হয়ে যায় তবে এ ধরনের আঘাতে কোন কিসাস নেই, জরিমানাও নেই।[৯] আবু হানিফা র.-এর মতে মূদিহাহ, হাশিমাহ, মুনাককিলাহ এবং আম্মাহ পর্যায়ভুক্ত আঘাত যদি ভালো হয়ে যায়, আর আঘাতের চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে তবে এই আঘাতে কিসাস ও জরিমানা কোন শাস্তিই হবে না।[১০] উল্লেখিত মতামত বিবেচনায় আমার (গ্রন্থকার) মতে এ ধরনের অপরাধে তাযিরী শাস্তি আবশ্যিক। যাতে অপরাধী শাস্তির বাইরে না থাকে। মালিকী মতাবলম্বী ফকীহগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতও তাই। ভুল আঘাতে চেহারা শরীর মাথা কিংবা দেহের কোন অংশের আঘাতের জখম শুকিয়ে গেলে যদি তাতে কোন দৃষ্টিকটু চিহ্ন না থাকে, শরীয়ত এ ব্যাপারে কোন জরিমানা বা দিয়্যাত ধার্য করেনি। যেমন, মেরুদণ্ডের হাড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ হাড় যদি ভেঙে গিয়ে আবার জোড়া লেগে যায় এবং তাতে কোন ধরনের ক্রটি বা বক্রতা সৃষ্টি না হয় তবে অপরাধীর কোন জরিমানা বা দিয়্যাত দিতে হবে না। কিন্তু এ ধরনের অপরাধে অপরাধীকে তা'যিরী শাস্তির বাইরে রাখা কিংবা কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা না থাকা মোটেও সঙ্গত হতে পারে না।[১১]

আল্লামা ইবনে হাযম র. বলেন, অনিচ্ছাকৃত অপরাধ অপরাধের পর্যায়েই পড়ে না। কেননা মা'সিয়াত বা অপরাধ সেই সব কর্মকেই বলা হয় যা আল্লাহ তাআলা বা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। ভুল এমন অপরাধ নয় যা আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'আল্লাহ কারো উপর তার সামর্থ্যের অতীত কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না' (২ : ২৮৬)। অর্থাৎ এমন কথা কেউ

বলতে পারবে না যে তার কোন ভুল হবে না। ইবনে হাযম র. বলেন, ভুলের জন্য কোন জবাবদিহিতা কিংবা শাস্তি নেই। ভুলের জন্য মানুষ গোনাহগার হয় না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের ওপর কোন গোনাহ নেই যা তোমরা ভুলক্রমে করো কিন্তু তোমরা স্বেচ্ছায় যা করো তাতে গোনাহ হবে।'

রসূল স. বলেন, 'মহান আল্লাহ আমার উম্মতের ভুলচুক ক্ষমা করে দিয়েছেন, সেই সাথে তাদের ওপর বল প্রয়োগ করে যেসব কাজ করানো হয় তাও ক্ষমা করে দিয়েছেন।'

মহান আল্লাহর বাণীতে, 'সকল সম্পদই পবিত্র।' 'তোমরা অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করো না।' খেতে পারো পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে।' নবী করীম স. বলেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের প্রাণ তোমাদের জন্যে হারাম। অর্থাৎ তোমরা এগুলোর ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। ভুল বশত যদি কোন অন্যায় হয়ে যায় তাতে কোন জরিমানা আবশ্যিক নয়, যদি না অকাট্য প্রমাণ বা ফকীহদের সর্বসম্মত রায় দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়। এমন কিছু না ঘটলে ভুলকৃত অপরাধ ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হবে।[১২]

ইবনে হাযম র.-এর এই মতের ভিত্তি হলো, ভুলের উর্ধে থাকা কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ফকীহগণের সর্বসম্মত মূলনীতি হলো, আল্লাহ তাআলা সাধ্য অনুযায়ী মানুষকে শরীয়তের পাবন্দ বানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে মানুষের দ্বারা অপরাধ ঘটে যায়। কিংবা উদ্দিষ্ট কর্মের জন্য পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও যথাযথ উপকরণ ব্যবহার না করার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এ ধরনের ভুলবশত অপরাধ এমন যে, মানুষ ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে তা এড়াতে পারে কিংবা নিরাপদ থাকতে পারে। কাজেই ভুলবশত অপরাধ থেকে বাঁচা মানুষের সাধ্যের বাইরে এ কথা বলা ঠিক নয়। সেই সাথে ভুলে কৃত অপরাধ মূলত অপরাধ নয় এমনটি বলাও ঠিক নয়।

আমরা যদি ইবনে হাযম র.-এর মতামত মেনেও নেই, তবুও বৃহত্তর স্বার্থে ভুলবশত কৃত অপরাধেও তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের এখতিয়ার প্রশাসনের আছে। নীতিগতভাবে যদিও যেসব ক্ষেত্রে হদ্দ প্রযোজ্য নয় শুধু এসব ক্ষেত্রেই জনস্বার্থে প্রশাসন শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু মাকরূহ কাজ করা এবং মুস্তাহাব কাজ না করার জন্যেও বৃহৎ কল্যাণে প্রশাসন শাস্তি দিতে পারে। বরং জনস্বার্থের বিবেচনায় যেসব কর্মকাণ্ড অপরাধের আওতায় পড়ে না, এসব ক্ষেত্রেও প্রশাসন শাস্তি দিতে পারে।

রসূল স.-এর হাদীস, 'উম্মতের সকল ভুলবশত কৃত অপরাধ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়ছেন' কোন কোন ইমামের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। 'সুবুলুস সালাম' কিতাবের লেখক বলেন, ইবনে আবু হাতিম উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনা সূত্র সম্পর্কে তাঁর পিতার কাছে জিজ্ঞেস করলে তাঁর পিতা বলেন, 'এই হাদীস পরিত্যাজ্য। 'এটির বক্তব্য সম্পূর্ণ মওজু (বানোয়াট)।' 'আবদ ইবনে আহমদ' 'আল-ইলাল' গ্রন্থে লিখেছেন, আমি আমার পিতার কাছে এই হাদীসের সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এই হাদীস সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।' এ হাদীসটি 'হাসান'

সনদে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ 'খাল্লাল' আহমদ র. সূত্রে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি মনে করে ভুলে কৃত অপরাধে মানুষের কোন জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা শাস্তি হবে না, সে আল্লাহর কিতাব ও রসূল স.-এর সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ করলো। কেননা, আল্লাহ তাআলা ভুলবশত হত্যাকাণ্ডে কাফফারা ধার্য করেছেন। বর্ণিত হাদীস থেকে বোঝা যায়, আখেরাত সম্পর্কিত কোন বিধান যদি ভুলে স্মৃতিভ্রমে কিংবা জবরদস্তির আওতায় করা হয় তবে তাতে কোন শাস্তি হবে না। একে ভিত্তি করে জাগতিক কোন বিধান কিংবা কোন আইন লংঘনের বিষয়ে সমাধান দেয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[১৩]

বস্তুত হত্যা ও হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে তাযিরী শাস্তি না দেয়ার ব্যাপারে উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয় না।

যেসব আঘাতে শরীরে কোন চিহ্ন থাকে না সেসব আঘাতের তা'যিরী শাস্তি

আঘাতে যদি আক্রান্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গ কাটা না পড়ে এবং অঙ্গের অবয়ব অক্ষুণ্ন থাকার পাশাপাশি অঙ্গের কার্যকারিতাও অবশিষ্ট থাকে অথবা আঘাতের ফলে মাথা ও মুখমণ্ডলে কোন ক্ষত সৃষ্টি না হয় কিংবা শরীরের অন্য কোন অংশে কোন ধরনের বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি না হয়, এমতাবস্থায় অধিকাংশ ফকীহর মত হলো, এগুলোতে কোন কিসাস সাব্যস্ত হবে না। বস্তুত থাপ্পড়, ঘুষি, কনুই, চাবুক অথবা ডাণ্ডা দিয়ে আঘাতের কোন কিসাস নেই, যদি না এসব আঘাতে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে কোন প্রকার আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি হয়। তবে এসবে তা'যিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে।[১৪]

কোন কোন মালিকী ফকীহ বলেন, চাবুকের আঘাতে যদি কোন ধরনের ক্ষত কিংবা দাগ সৃষ্টি না হয় তবে তাতেও কিসাস ওয়াজিব হবে না। থাপ্পড় বা ডাণ্ডা দিয়ে আঘাতের কারণে যদি মাথা বা শরীরে আঘাতের চিহ্ন না হয় তাহলেও কিসাস ওয়াজিব হবে না।[১৪] ইমাম ইবনে কাইয়্যেম এবং কোন কোন হাম্বলী ফকীহর মতে মারামারি ও থাপ্পড়ের আঘাতেও কিসাস ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অতএব যে কেউ তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে' (২ : ১৯৪)।

অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'তুমি যদি কাউকে শাস্তি দিতে চাও, তবে এতটুকু শাস্তি দাও যতটুকু তোমাকে দেয়া হয়েছে।'

উল্লেখিত আয়াতগুলোর সারকথা হচ্ছে, কিসাসে সমতা থাকতে হবে। এজন্য অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে। যদি সমতাপূর্ণ শাস্তি দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে এর কাছাকাছি কোন শাস্তি দিতে হবে। অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে যদি সব দিক দিয়ে সমতা বিধান করা সম্ভব না হয় তাহলে কিসাসের শাস্তি রহিত হয়ে যায়। উপরে উল্লেখিত ফকীহগণের নিকট থাপ্পড়ের শাস্তি হিসেবে থাপ্পড়, আঘাতের শাস্তি হিসেবে আঘাতই সবচেয়ে উপযুক্ত। বাহ্যিক ও শরয়ী উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা'যিরী শাস্তির চেয়ে এই কিসাস বেশি উপযোগী। কেননা, তা'যিরী শাস্তি স্বভাব ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই অপরাধের চেয়ে ভিন্ন রকম হয়। উপরে বর্ণিত প্রমাণাদি

উপস্থাপন ছাড়া থাপ্পড়ের অপরাধে কিসাসের সমর্থক ফকীহগণ বলেন, হযরত আবু বকর রা. হযরত উসমান রা. হযরত আলী রা. এবং হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. থাপ্পড়ের অপরাধে কিসাস কার্যকর করেছেন।[১৫]

তথ্যপঞ্জি

১. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৮। তাতে লেখা হয়েছে, যে ইচ্ছাকৃত হত্যার কিসাস ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে যে, প্রশাসন তাকে শাস্তি দিতে পারে কিনা? ইমাম মালিক র. ও ইমাম লাইছ র. বলেন, প্রশাসন তাকে একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের কারাবাসের শাস্তি দিতে পারে। মদীনার ফকীহগণও এ মতের সমর্থক। হযরত উমর রা.-এর সূত্রেও এমন বর্ণনা রয়েছে। ইমাম ইসহাক ও আবু ছাওর র. বলেন, অভিযুক্ত এতে অবশ্য শাস্তি যোগ্য অপরাধী নয়। আবু ছাওর র. বলেন, অপরাধী যদি দুস্কৃতকারী হিসেবে কুখ্যাত হয় তবে প্রশাসন তার সংশোধনের জন্যে উপযোগী শাস্তি দিতে পারে। প্রথম পক্ষের প্রমাণ একটি অতি দুর্বল হাদীস আর দ্বিতীয় পক্ষ জাহেরী রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণ পেশ করেন। এসব ক্ষেত্রে শাস্তি নির্ধারণের পক্ষে কোন না কোন দলিল থাকা জরুরী। অথচ উল্লেখিত অবস্থাগুলোতে শাস্তি দেয়ার পক্ষে কোন নস নেই। সূত্র : তাবসিরাতুল হুককাম, ইবনে ফারহুন। উল্লেখিত কথাগুলো ফাতহ আলাল মালেকীর হাশিয়ায় ছাপা হয়েছে (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৫)। তাতে বলা হয়েছে, 'ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে যদি দিয়্যাত ক্ষমা করে দেয়া হয় তবুও হত্যাকারীর দিয়্যাতের টাকা পরিশোধ ওয়াজিব এবং তার কাফফারা আদায় করা মুস্তাহাব। তাছাড়াও তাকে শত বেত্রাঘাত ও এক বছর কারাবন্দী রাখা হবে। সূত্র : আদদিয়্যাত ফিশ শারিয়াতিল ইসলামিয়া, ড. আলী সাদেক আবু হায়ফ, পৃষ্ঠা ২২-২৩; শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৯৮, তাতে লেখা আছে : যদি ক্ষমা না করা হয় তবে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে কিসাস কার্যকরী করা ওয়াজিব। আর ক্ষমা করে দিলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। যদি এই ক্ষমা কোন ধরনের দেনা-পাওনার বিনিময়ে হয়ে থাকে, তবে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে যে বিনিময় নির্ধারিত হবে তাই পরিশোধ করতে হবে। হত্যাকাণ্ডের দিয়্যাত হিসেবে যে মূল্য সাব্যস্ত ছিলো তা ওয়াজিব হবে না।

২. আল-মুহাল্লা, ইবনে হাযম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৬১। এরপর দেখুন একই কিতাবের পৃষ্ঠা ৭১। নিহায়াতুল মুহতাজ শরহে আল মিনহাজ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৭৩। তাতে লেখা আছে, অনেক সময় তা'যিরী শাস্তির সাথে কাফফারা একীভূত হয়ে যায়। শরহে আল মিনহাজের হাশিয়ার ১৭৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, যেসব হত্যাকাণ্ডে কিসাস ওয়াজিব হয় না, তন্মধ্যে একটি হলো, পিতা কর্তৃক পুত্র হত্যা। কাশ্শাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭২, মুঈনুল হুককাম, পৃষ্ঠা ১৭৭। তাতে লেখা আছে, এক ব্যক্তি কাউকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখলো

কোন হিংস্রজন্তু এসে লোকটিকে মেরে ফেলল। তাতে কিসাস ও দিয়্যাত কোনটাই ওয়াজিব হবে না বটে কিন্তু বেধে রাখার কারণে অভিযুক্তকে তা'যিরী শাস্তি দেয়া যাবে। তাকে আমৃত্যু বন্দী করে রাখা হবে। আবু হানিফা র.-এর মতে এতে দিয়্যাত ওয়াজিব হবে।

৩. হাশিয়া ইবনে আবদীন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮৪/১৮৫ আসসিয়াসাতুর রাঈয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা ৫৫, আলকাসানী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৩৪।

৪. কাশশাফুল কিনা আন্‌মাতানিল ইক্‌না খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩।

৫. মাওয়াহিবুল জালীল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৭, আততাজ ওয়াল ইকলীল, মুখতাসার আল-খালীল পৃষ্ঠা ২৪৬। আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১১২।

৬. মাওয়াহিবুল জালীল খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা, ১৪৬, তাতে লেখা আছে, মুখতাসার আল ওয়াতার-এ লেখা হয়েছে, কারো চোখে যদি আঘাত লাগে এবং দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায় কিন্তু দৃশ্যত চোখ ঠিকই দেখা যায় তাহলে তাতে ৫০০ দিরহাম দিয়্যাত দিতে হবে, কিন্তু কিসাস হবে না, যদিও ইচ্ছাকৃতভাবেই এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। কারণ এখানে কিসাস কার্যকরী করার কোন উপায় নেই।

কারো আঘাতে হাতের কার্যকারিতা রহিত হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান যখন হাতের অবয়ব দৃশ্যত ঠিকই দেখা যায়। কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া কিন্তু জিহ্বা না কাটার ক্ষেত্রেও একই বিধান। অনরূপ হুকুম উল্লেখিত ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সব ক্ষেত্রে।

৭. আহকামুস সুলতানিয়া, আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা ২৪৩। আহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা ২০৯। হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮৪।

৮. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৬।

৯. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২৪।

১০. মাওয়াহিবুল জালীল, খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা ৩৪৬।

১১. এ মত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, আল মুহাল্লা, ইবনে হাযম, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৪১৩।

১২. সুবুলুস সালাম, আস সানআনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১৭।

১৩. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৯৯, মুঈনুল হুক্কাম, পৃষ্ঠা ১৭৭, তাতে লেখা আছে, থাপ্পড়, ঘুষি, ধাক্কা, মারপিট ইত্যাদিতে কিসাস নেই।

১৪. আল মাওয়াহিবুল জালীল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৬, তাতে লেখা আছে, থাপ্পড় মারার অপরাধে কিসাস নেই, তবে অপরাধীকে সংশোধনমূলক শাস্তি দেয়া যাবে। শায়খ আবুল হাসান বলেন, এর কারণ হলো, থাপ্পড়ের পরিমাপ করা যায় না। তাছাড়া ব্যক্তির ভিন্নতায় থাপ্পড়ের মধ্যেও পার্থক্য থাকে, তাই এতে সংশোধনমূলক শাস্তি সাব্যস্ত হবে। অনুরূপ ডাণ্ডার আঘাতের বহুল আলোচিত মতামত হলো, এতেও কিসাস নেই যদি না তাতে ক্ষত সৃষ্টি হয়। যদি ক্ষত সৃষ্টি হয় তবে কিসাস কার্যকর হবে। 'আননাওয়াদের' কিতাবে 'যে

থাপ্পড় ও মারপিটে কিসাস নেই' শীর্ষক পরিচ্ছেদে এ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'মুদাওয়ানা' কিতাবে বলা হয়েছে, 'আবুল কাসিম বলেছেন, 'চাবুকের আঘাতের কিসাস আছে'। ইমাম মালিক র.-এর বরাতে বলা হয়েছে, চাবুকের আঘাতের কিসাস নেই তবে সংশোধনমূলক শাস্তি দিতে হবে। ইবনে আরাফা শায়খ আশশিহাব থেকে বর্ণনা করেন, থাপ্পড়, চাবুকের মার, ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত অথবা অনুরূপ কিছু দিয়ে মারপিটের কিসাস নেই যদি না এসবের আঘাতে জখম সৃষ্টি হয়।

১৫. ইলামুল মুকিঈন, ইবনে কাইয়্যেম আলজাওযিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২, আল কুরদী আল আযহারীর মুদ্রিত সংস্করণে লেখা হয়েছে, শাফিয়ী, হানাফী মালিকী এবং হাম্বলী মতানুসারীদের মুতাআখ্‌খেরীন ফকীহদের মত থাপ্পড় এবং মারপিটে কিসাসের শাস্তির বিপক্ষে। তারা এ ধরনের অপরাধে তা'যিরী শাস্তির পক্ষে। কেউ কেউ বলেন, মূলত এসব অপরাধে কিসাস ওয়াজিব। ইমাম আহমাদ থেকে এ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হয়েছে। এজন্যে দেখুন, আল-ইকনা খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৯২, আল মাতবাআতুল মিসরিয়্যা, আল আযহার, সম্পাদনা ও টীকা অধ্যাপক আবদুল লতীফ মুহাম্মদ মূসা আসসুবকী। কাশশাফুল কিনা, পৃষ্ঠা ৭৩২। তাতেও বলা হয়েছে, থাপ্পড়, ঘুষি কিংবা ধাক্কা দেয়ার অপরাধে কিসাস সাব্যস্ত হয় না : এগুলোতে তা'যির সাব্যস্ত হয়, কারণ এগুলো এমন অপরাধ যেগুলোতে কোন নির্দিষ্ট কিসাস নেই।

অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১২, পৃষ্ঠা : ১০৭-১০৮

যৌন জীবন সম্পর্কে আল-কুরআনের বিধান

মু. শওকত আলী

জীবনকে সহজীকরণ

১. বস্তুত: আল্লাহ তোমাদের কাজ সহজ করে দিতে চান, কোন কঠোরতা আরোপ বা কঠিন কাজের ভার দেওয়া আল্লাহর ইচ্ছা নয়। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৫ এর অংশ)

যৌন ইচ্ছা পূরণের জন্য ইসলামে বিবাহকেই একমাত্র উপায় হিসেবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ককে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এরূপ সম্পর্কের জন্য ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অবৈধ যৌন কর্মের জন্য শাস্তির বিধান

১. ব্যভিচারী মেয়েলোক ব্যভিচারী পুরুষ উভয়ের প্রত্যেককেই ১০০টি চাবুক মারো। আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া কনুকম্পার ভাবধারা যেন তোমাদের মনে না জাগে। যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো; আর তাদেরকে শাস্তিদানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে। (সূরা নূর, আয়াত ২)

২. যেনার নিকটও যেও না, এটি অত্যন্ত খারাপ কাজ আর এটি খুবই নিকৃষ্ট পথ। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩২)

ইসলামী দণ্ডবিধি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে স্থায়ীত্ব ও নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সে জন্যই প্রয়োজনে অসীম ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্বও করে থাকে। কারণ তা জন্নাতের পথ প্রদর্শন ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটিই একটি নিরাপদ ও নিরুপদ্রব সমাজ গঠনে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কুরআন যৌন সম্পর্ককে শুধুমাত্র প্রজননের উদ্দেশ্যেই চিত্রিত করেনি বরং তার মাধ্যমে মনের প্রশান্তি এবং দৈহিক আনন্দ উপভোগের কথাও বর্ণনা করেছে। স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যার দ্বারা একে অপরকে ভালবাসা, দয়া, স্নেহের, উষ্ণতা ও আরামবোধ প্রদান করে।

লেখক : বোর্ড সেক্রেটারী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ।

৩. রোযার সময় রাত্রিবেলা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ, আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ জানতে পেরেছেন যে তোমরা গোপনে গোপনে নিজেদের সাথে নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করছো। কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং আল্লাহ যে স্বাদ গ্রহণ তোমাদের জন্য জায়েয করে দিয়েছেন তা আস্বাদন কর। (সূরা বাকারা আয়াত ১৮৭-এর অংশ)

ইসলামী আইন ও বিচার
গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার' এর গ্রাহক / এজেন্ট হতে চাই

☐ আমার জন্য ☐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ☐ বছরের জন্য ☐ কপি প্রতি সংখ্যা

নাম ....

পদবী ....

পেশা ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

ঠিকানা ....

.... ফোন/মোবাইল: ....

গ্রাহক পত্রের সঙ্গে .... টাকা নগদ/মানি অর্ডার করুন।

কথায় (..)।

স্বাক্ষর
ম্যানেজার

স্বাক্ষর

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না, ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন
২০ কপির উর্ধে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ৩৫X৪ = ১৪০/=

=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) =৩৫X৮ = ২৮০/=

=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য- (বার সংখ্যা) =৩৫X১২ = ৪২০-২০=৪০০/=

গ্রাহক ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

REGD. NO. DA 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : October-December -2007, TK : 35